সুরভি প্রকাশনীর পক্ষে
প্রকাশক :
শ্রীসরোজবরণ মুখোপাধ্যায়
১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
শ্রীগণেশ বসু

প্রথম প্রকাশ :
২৬ জানুআরি ১৯৬০

মূল্য : তিন টাকা

ব্লক :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

গ্রন্থন :
মোসলেম খান এণ্ড ব্রাদার্স

মুদ্রাকর :
শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২ ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বন্ধুবরেষু

এই লেখকের অন্য উপন্যাস

চার দেয়াল

১

ঘরে ঢুকেই প্রভাত চমকে ওঠে। ফুলকাকীমা! আবার এসে হাজির হয়েছেন! কদ্দিনের মনে কে জানে!

খিলখিলিয়ে হেসে উঠে মাধবীলতা তখন বলছে, 'না দিদি, আজ তো আমি থাকতে পারব না। থাকতে আসিনি। মনটা বড় উদাস হয়ে গেছিলো। কাল শেষ রাত্তিরে ভারী বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে অব্দি সেই যে ঘুম ছুটে গেলো, কিছুতেই যেন মনের মধ্যে আর শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। যেদিকে তাকাই কেবল মৃত্যুর বিষণ্নতা। ঘরের মধ্যে চারিদিকের দেয়ালগুলো যেন আমার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে আমাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে। মেয়ে তিনটেকে নিয়ে তখন কী করি, ছুটে চ'লে গেলুম ছাতে। কিন্তু দিদি সেখানেও আশ্রয় পেলুম না। ছাতের বাইরে যেদিকে তাকাই—পাষাণ-কায়া! হায় রে রাজধানী, পাষাণ-কায়া! বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে, ব্যাকুলা বালিকারে নাহিকো মায়া! দুপুরবেলা আর থাকতে না পেরে বললুম মাকে, মা আর তো পারিনে মা, আমার বুকের মধ্যে অশান্তির ঝড় উঠেছে, দিদির বাড়িতে একবার না যেতে পারলে তো এ-ঝড় শান্ত হবে না। আশালতা স্বর্ণসীতা ঝরাপাতা তিনটেই আমার সঙ্গে আসার জন্যে বায়না ধরলো। তা আমি বললুম, যাবি তো চ', অনেকদিন দেখিসনি তোদের জেঠিমাকে, দেখে আসবি চল। কিন্তু বাগড়া দিলে মা। আমাকেই আটকে দিয়েছিলো আরেকটু হলে। তা আমি তখন কী আর করি, চালাকি ক'রে ফাঁকি দিয়ে একাই পালিয়ে এলুম। আর এলুম ব'লেই না মনটা হাল্কা হ'লো, মনের বোঝা নামানো গেলো। কিন্তু দিদি, থাকবার উপায় নেই আজ।'

'তবু ভালো'—প্রভাতের মা হিরণ্ময়ী বললেন, 'তা'লে এখন তুমি ওঠো।

বেলা থাকতে থাকতে ফিরে যাও। রাত হয়ে গেলে যা বাজে গুণ্ডাপাড়া শুনি তোমাদের, ঝামেলায় প'ড়ে যাবে।'

'ঝামেলা কী আর দিদি, একা-একা তো আর ফিরব না। আসবার সময় কে আমাকে নিয়ে আসে তাই একাই আসতে হ'লো। প্রভাত ফিরুক আপিস থেকে, সে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কখন ফেরে ও?'

হিরণ্ময়ী তাকালেন প্রভাতের দিকে।

বিরক্তির ধাক্কায় প্রভাত কী করবে ঠিক করতে না পেরে, বেতের চেয়ারটা সশব্দে টেনে নিয়ে, টেবিলের ওপর রাখা রেডিওর চাবিটা খুলে দিয়ে চোখ পাকিয়ে রইলো রেডিওটার দিকেই।

আর তখন মাধবীলতা ঘাড় ফেরায়। প্রভাতকে দেখতে পেয়েই উঠে প'ড়ে এগিয়ে আসে বলতে বলতে, 'ওমা তুমি এসে গেছো? কখন এলে বলো তো, আমি তো একদম টের পাইনি'—কাছে এসে সে প্রভাতের পিঠে-মাথায় একটু হাত বোলায়, ততক্ষণে রেডিওটা গান গাইতে শুরু করেছে, কয়েক মুহূর্ত রেডিওটার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে সে ব'লে ওঠে, 'কী গান রে বাবা! এ কি গান না বেড়ালের কান্না! এরেই আধুনিক গান বলে, না? এগুলো শুনলেই না আমার বড়ো বিরক্তি বোধ হয়। বন্ধ ক'রে দাও না প্রভাত, তোমার রুচি তো এর'ম ছিলো না, তুমি কি বদলে গেলে? আচ্ছা আমি বন্ধ ক'রে দিচ্ছি, কোন্ চাবিটা ঘোরাব?'—ব'লে মাধবীলতা একটি হাত এগিয়ে দেয়।

পাছে ভেঙেচুরে ফ্যালে এই ভয়ে প্রভাত নিজেই রেডিওটা বন্ধ ক'রে দেয় চট ক'রে। দিয়ে সতর্ক থাকে ফুলকাকীমা রেডিওর চাবিগুলো না টানাটানি করে। অবিশ্যি সেই সঙ্গে এ-বিষয়েও সে সতর্ক থাকে যাতে তার হাতের সঙ্গে ছোঁয়াছুয়ি না হয় ফুলকাকীমার বাড়িয়ে-দেয়া হাতটার।

মাধবীলতার মুখে মধুর হাসি ফোটে। পরম স্নেহে প্রভাতের শার্টের কলার থেকে একটা ছারপোকা টেনে বের ক'রে মেঝেয় ফেলে পায়ের তলায় পিষলো। বললো একটি হাত প্রভাতের কাঁধে রেখে, 'রেডিওটা কত দিয়ে কিনেছিলে প্রভাত?'

নিরুত্তরে প্রভাত উঠে পড়লো চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে। জামা খুলে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে হাত-মুখ ধুতে চ'লে যায় বারান্দায়।

ফিরে যখন এলো, গামছায় হাত-পা মুছতে মুছতে শুনলো ফুলকাকীমার মুখে রেডিও-প্রসঙ্গ তখনো চলছে।

'আমি একটা রেডিও কিনব। এটা কী মডেল? প্রভাত, কী মডেল এটা?'

'সে শুনে আপনার কী হবে!'—প্রভাত রুক্ষ গলায় বলে।

মাধবীলতা অবাক হয়ে যায় প্রভাতের কথা শুনে, হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে, 'ওমা শোনো ছেলের কথা! বলে কিনা কী হবে, আরে আমি যে কিনব একটা। সারাটা দিনরাত, দিনের পর দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে ব'সে-ব'সে শুনতে হয়। কী যে ক্লান্তি লাগে তখন। বুকের মধ্যে আমার মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস উঠতে থাকে হা-হু, ব'সে ব'সে তাই শুনি! তার বদলে, না হয় তোমার ঐ আধুনিকই শুনব!'—বলতে বলতে মাধবীলতা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, 'তা বলো না ভাই কত দাম পড়বে একটা ভালো রেডিওর। এটা কতয় কিনেছিলে?'

'হাজার টাকা!'—প্রভাত বললো ঠাস ক'রে।

'হাজার?'—মাধবীলতা চিন্তায় পড়লো। কিন্তু শেষে বললো, 'আচ্ছা তা সার্ভিস কেমন পাচ্ছো? ভালো? না অ্যাঁ? অ্যাঁ? বলো না প্রভাত অ্যাঁ? ভালো? তাহ'লে বেশ, আমাকে তোমাদের এই মডেলই একটা কিনে দাও। কিন্তু হাজার? অত টাকা তো ভাই আমার হাতে আর নেই এখন। গয়নাগুলো বাঁধা দিতে অনেকগুলো টাকা হাতে এয়েছিলো বটে, কিন্তু তার এককাঁড়ি টাকা তো বেরিয়ে গেলো তরফদার সেতারটা কিনতে। খুব জোর আর সাত-আট শো টাকা আমার ট্রাংকে থাকতে পারে। দু-তিনশো টাকা তা'লে আরো যোগাড় করতে হয়। দিদি, ও দিদি শুনছেন, আমার এই ধরুন তিনশোটা টাকা দরকার হচ্ছে—আপনি চালিয়ে দিতে পারেন না আপাতত? আমি তিন মাসের মধ্যেই ঠিক শোধ ক'রে দেব। একটা টিচারি পাচ্ছি কিনা আসচে মাস থেকে, আমাদের প্রতিবেশী রসময়বাবু ঠিক ক'রে দেবেন বলেছেন, একশো টাকা ক'রে মাইনে দেবে বলেছে—'

'নে প্রভাত'—হিরণ্ময়ী ডাক দিলেন রুটি আর ফলের ডিশ এগিয়ে দিয়ে।

প্রভাত এগিয়ে গিয়ে ফুলকাকীমাকে পেছন ক'রে ব'সে, খেতে শুরু করলো।

'তুমি কিছু খাও না?'—হিরণ্ময়ী মাধবীলতাকে জিগ্যেস করলেন, 'দেব কেটে দুটো শসা আর ফুটি?'

'তা দিদি দিন। কিছু না খাইয়ে কি আর ছাড়বেন। দিদি, আজ পেরাম্বুলেটরটা নে যাব ভাবছি। কোথায় ওটা?'

'বারান্দায় আছে ছাইপাঁশ স্তূপাকারের মধ্যে'—হিরণ্ময়ী বললেন অপ্রসন্ন মুখে, 'নিয়ে যাবে ভালোই, তবু একটা উৎপাত থেকে রক্ষে পাওয়া যায়। কিন্তু কেমন ক'রে নিয়ে যাবে? এতটা রাস্তা?'

'আপনিও দিদি যেমন'—মাধবীলতা খিলখিলিয়ে ওঠে, 'এটা যে কলকাতা শহর সেটা ভুলে গেলেন! গাঁটের কড়ি ফেললে যে চোখ বুজে আপনার এই মেছোবাজারের বাসা থেকে ছিষ্টির জিনিসপত্র তুলে নে যাওয়া যায় আমাদের চড়কডাঙার বাসায়! কিসে সুবিধে হবে প্রভাত? ট্যাক্সি? না ঘোড়ার গাড়ী? ট্যাক্সিতে কি পেরাম্বুলেটর ধরবে? তারচে' ঘোড়ার গাড়ীই বেশ। কতদিন চড়িনি ঘোড়ার গাড়ী—কেষ্টনগর ছেড়েছি পর থেকে আর চড়া হয়নি। উঃ কতকাল হবে সে—এখন আমার ধরুন চৌত্রিশ বছর চলছে, বিয়ে হ'লো আঠারোয়, তা'লে ধরুন গে'—মাধবীলতা কর গুনে হিসেব ক'রে বললো, 'ষোলো বছ—র? চড়িনি ঘোড়ার গাড়ী? উঃ কী অদ্ভুত এই জীবন! কেমন বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলুম জিনিসটা! অথচ কত প্রিয় ছিলো আমার ঐ ঘোড়ার গাড়ী চড়া। জানেন দিদি, আমার তখন তেরো কি চোদ্দ বছর বয়স হবে, আমার জন্মদিনে বাবা জিগ্যেস করলেন আমাকে, মাধু কী তুমি চাও বলো, আমি বললুম সবাই মিলে চলো। বাবা একটা ফিটনে ক'রে নদীর ধার থেকে হাওয়া খেয়ে আসি। সবাই তো সে-কথা শুনে হেসেই খুন। বাবা বললেন, পাগলী মেয়ে!'—বলতে বলতে মাধবীলতার চোখে জল এসে যায়। চোখের কোল বেয়ে পড়ছে জল, কিন্তু মুখে কোন বিকৃতি নেই, বারান্দার দিকে আকাশের পানে তাকিয়ে যেন আর এ-জগতে নেই সে এমনি ক'রে ব'সে রইলো বিভোর হয়ে।

'আহ্লাদে আটখানা, নেজা মুড়ো নিয়ে দশখানা!'—ছড়া কাটলেন প্রভাতের ঠাকুমা সুনয়নী যিনি এতক্ষণ জবুথবু বসেছিলেন গালে হাত দিয়ে মাধবীলতার দিকে রোষকষায়িত নেত্রে তাকিয়ে। বললেন মুখ নেড়ে, 'ছ্যাঃ। বলে, উদ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙ্গে। কপালে দু-বেলা ভাত জুটত না আর জন্মদিনে কিনা ফেটিন হাঁকানোর বিত্তান্ত। আরো কতই শোনাবি রে বাছা!'

কিন্তু এসব বুঝি মাধবীলতা শুনতে পায় না। নিজের মনেই বলে সে একটু পরে, 'প্রতনু, তোমার দাদা তো আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে, তুমি কী করবে তোমার ফুলকাকীমার জন্যে? তুমি না হয় ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এসো একটা।'

প্রতনু আয়নায় চুল ঠিক করছিলো, ফুলকাকীমার দিকে সে আদৌ মনোযোগ দিলে না, নির্বিকার অন্যমনস্কভাবে সে বইয়ের র‍্যাক থেকে ভেবে-ভেবে খান-দুই বই টেনে নিয়ে আপন মনে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হিরণ্ময়ীর ডাকে থমকে দাঁড়ালো।

'গাড়ী আনতেই যাচ্ছিস তো তুই?'—হিরণ্ময়ী জিগ্যেস করলেন।

'আমার এখন সময় নেই। একটা মিটিঙে যাচ্ছি'—ব'লে প্রতনু বেরিয়ে গেলো।

'আমারও একটা কাজ আছে'—প্রভাত বললো কঠিন চোখেমুখে, 'আমারও বেরুতে হবে এখন অন্য কাজে'—ব'লেই সে উঠে প'ড়ে জামাটা টেনে নিলো।

এমনি সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন শান্তিদেব। ঢুকেই মাধবীলতাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। চমক ভাঙে তাঁর যখন দেখলেন মাধবীলতা এগিয়ে আসচে তাঁর দিকে হাসিমুখে। 'দাঁড়াও দাঁড়াও'—ব'লে শশব্যস্তে তিনি তাঁর বিদ্যাসাগরী চটিজোড়া খুলে ঠেলে দিলেন আলনার দিকে, দিয়ে তারপর তিনি মাধবীলতার প্রণাম নিলেন।

প্রণাম ক'রে উঠে মাধবীলতা ওঁর হাত থেকে ছাতাটা এবং গলা থেকে মটকার চাদর নিয়ে রাখলো যথাস্থানে। তারপর বললো, 'ভাগ্যিস্ এলেন দাদা, আরেকটু পরে এলেই আজ আর দেখা হত না আমার সঙ্গে।'

শান্তিদেব তাঁর স্বভাবপ্রসন্ন হাসি হাসলেন। জিগ্যেস করলেন শান্ত গম্ভীর গলায়, 'মেয়েরা কই? আসেনি?'

'না দাদা, আজ একদম ঝাড়া হাত-পা এয়েছি।'

'সব ভালো তো ওরা? অসুখ-বিসুখ নেই তো কিছু? টিকে দিয়েছো তো সবাইকে? সাবধান সাবধান, এবার কলেরা বসন্ত দুটোই ভয়ানক আকারে লেগেছে চতুর্দিকে। তোমার কি যাবার সময় হয়ে গেলো নাকি? গেলে অবশ্যি রাত না ক'রে তাড়াতাড়িই যাওয়া ভালো। তা কে দিয়ে আসবে তোমাকে? একা-একা কি পারবে যেতে?'

'না একা যাব কেন, প্রভাত যাচ্ছে আমার সঙ্গে। পেরাম্বুলেটরটা আজ নিয়ে যাব ভাবছি, ঘোড়ার গাড়ী ক'রে বেশ আনন্দ ক'রেই যাওয়া যাবে। তুমিই যাও না ভাই প্রভাত, একটা গাড়ী নিয়ে এসো না।'

শান্তিদেবের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। বললেন, 'ঘোড়ার গাড়ী! সে তো অনেক টাকা। তা বেশ, যা ভালো বোঝো করো।'

'ঘোড়ার গাড়ী বলছে ঘোড়ার গাড়ীই আন, ঐ ঠেলাগাড়ীটা নিয়ে যাবার তাল যখন তুলেছে—না নিয়ে কি আর ছাড়বে!'—হিরণ্ময়ী ঝলসাতে লাগলেন, 'যত আপদ-বালাই এসে জোটে সমস্তই এই বাড়িতে। অত্যাচারের আর সীমা নেই। সব্বাই মিলে আমার হাড়মাস—'

'গাড়ী যদি আনতে হয়'—প্রভাত রিরি করতে করতে মা হিরণ্ময়ীকেই

বললো, 'ভাড়া ঠিক ক'রে তো আনতে হবে। কোথায় বাড়ি কতটা রাস্তা আমি তো কিছুই জানি না, ভাড়া ঠিক করব কেমন ক'রে?'

জবাবটা মাধবীলতাই দিলো কিছুটা সন্ত্রস্ত গলায়, 'বোলো চড়কডাঙা সায়েব কলোনির বগলে, তা'লেই বুঝবে। কালীমন্দিরটার কাছে তাও বলতে পারো। খুব প্রাচীন মন্দির। লোকে অবিশ্যি বলে তালপুকুরের গোলকালী!'

প্রভাত ফুলকাকীমার দিকে তাকালো না। শুধু তার জবাবটা শুনে ঘাড় শক্ত ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

দরাদরি ক'রে শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকায় একটা ছ্যাকড়া গাড়ী পাওয়া গেলো। প্রভাত তাই নিয়েই ফিরে এলো মিনিট কুড়ি পরে। ঘরে পা দিয়েই সে সকলের চোখমুখ আর কথাবার্তার ধরন দেখে বুঝতে পারলো ফুলকাকীমা ইতিমধ্যে কিছু একটা কেলেঙ্কারি ক'রে ফেলেছেন! কিন্তু কী সেটা তা কাউকে জিগ্যেস করতে তার প্রবৃত্তি হয় না। ঘরের মধ্যে মাধবীলতা নেই। কোথায় গেলো আবার! বারান্দায় গিয়ে প্রভাত দেখলো, সেইখেনে সে দাঁড়িয়ে আছে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে। বিশ্রী অর্থাৎ বুকের কাপড় তার হাওয়া খেয়ে লুটোচ্ছে পায়ের তলায়, কিন্তু সে-সব তার কিচ্ছু খেয়াল নেই, আকাশে সূর্যাস্তের রঙের খেলার দিকে তাকিয়ে বিভোর গলায় সে গান ধরেছে। দেখে প্রভাতের আপাদমস্তক জ্ব'লে গেলো।

মাধবীলতা মোটামুটি গলা তুলেই আপন মনে তখন গাইছিলো :

'বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে
আমায় দেখো না বাহিরে!...'

সেখান থেকে ছিটকে স'রে এসে প্রভাত বললো খিটখিট ক'রে তার মায়ের কাছে, 'ডেকে আনতে পারছ না ওখান থেকে! পাড়ার লোকেরা সব বলবে কী ছিছিছি!'

এক শান্তিদেব ছাড়া ঘরের আর সকলেরই মুখে তখন মাধবীলতার চরিত্র বিশ্লেষণ চলছিলো। সুনয়নী বলছিলেন তিনি তাঁর আশি বছরের জীবনে অনেক পাগল দেখেছেন কিন্তু এমন সেয়ানা পাগল আর দেখেননি, তাছাড়া কোনও পাগল যে এত বড়ো বেহায়া আর মতলবী হতে পারে তাও তিনি বাপের জন্মে জানতেন না।

হিরণ্ময়ী চ'লে গেলেন বারান্দায়।

'এসো মাধবী, গাড়ী এসে গেছে'—হিরণ্ময়ী শান্তভাবেই বললেন।

চমক ভেঙে মাধবীলতা আকাশের থেকে চোখ নামিয়ে নিলো। সূর্য তখন

পশ্চিমে ঢ'লে পড়েছিলো, চামচিকে আর নাককাটিরা অন্ধকারের আভাস পেয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাদের সরু কালো ডানা মেলে নাচানাচি লাগিয়ে দিয়েছিলো বসন্ত সন্ধ্যার ঝিমধরানো হাওয়ায়, শালিক চড়ুই আর কাকের দল ডাক-চিৎকার শুরু করেছিলো সঙ্গীসাথীদের উদ্দেশে এবার ঘরে ফিরতে হবে ব'লে, চাঁদের তখনো দেখা নেই কিন্তু আকাশের মাথার ওপর যে-তারাটি ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছিলো মাধবীলতা তারই দিকে তাকিয়েছিলো অপলকে।

'দিদি, ঐ তারাটা দেখুন'—তখনকার সন্ধ্যার মতোই ঘন আর সুরেলা শোনালো মাধবীলতার গলা।

গম্ভীর বিরক্ত হিরণ্ময়ী অনিচ্ছুকভাবে তারাটার দিকে তাকালেন।

'ঐ তারাটা না, ও হচ্ছে যমের প্রহরী। বাবা আমাকে ছেলেবেলায় আকাশের সমস্ত তারা চিনিয়ে দিয়েছিলেন। কী আশ্চর্য সব কাহিনী আছে না তারাদের, শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আর কী অদ্ভুত যে লাগে না মনের মধ্যে, সে আর কী বলব। আমার বড়ো ইচ্ছে হয় দিদি আমি যেন ম'রে যাবার পর আকাশে অমনি এক তারা হয়ে ফুটে থাকি। আমাকে সবাই দেখবে, আমার সম্পর্কে কত কাহিনী তৈরী হবে, আমাকে কত কত নাম দেবে সবাই। দেখুন দিদি, আস্তে আস্তে কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তারাটা! হবে না! ওনার নাম যে লুব্ধক, দেমাকে যে ওঁর পা পড়ে না!'

হিরণ্ময়ী মাধবীলতাকে অগত্যা হাতে ধ'রে টেনে নিয়ে এলেন ঘরের মধ্যে।

বললো মাধবীলতা, 'এই যে প্রভাত, থাক যেতে হবে না গাড়ী আনতে, আজকে এখানেই থেকে যাব ভাবছি। বড্ড ভাল্ লাগছে মনের ভেতরটা'—বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যে ঘরে ফিরেছে ছাদ থেকে খেলাধুলো সাঙ্গ হবার পর, তাদের দিকে ফিরে-ফিরে তাকিয়ে মাধবীলতার মুখে মিষ্টি হাসি ফুটলো, অস্ফুটে বললো, 'পাখিরা সব ঘরে ফিরে এলো!'

কিন্তু সুনয়নী ইতিমধ্যে ফেটে পড়েছেন রাগে, মাধবীলতা যাবে না শুনেই।

হিরণ্ময়ী বললেন, 'যাবে না কী রকম! গাড়ী তো নিয়ে এয়েছে প্রভাত।'

'ওমা তাই নাকি? আনা হয়ে গেছে? তা'লে বরং আজ যাই, মেয়েগুলোও কান্নাকাটি করবে না গেলে। তা'লে ভাই আর দেরী কোরো না, অনেকটা রাস্তা তো। প্র্যামটা নেবে না?'

প্রভাত বুঝতে পারলো না জিনিসটা কী। হিরণ্ময়ীও পারলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সুনয়নী পারলেন, বললেন খ্যাঁকখেকিয়ে, 'আরে পেরাম বুঝলে

না? ঐ যে গো সায়েবী ঠেলাগাড়ী না কোন্‌ আপদ একটা রয়েছে বারান্দায় সেইটে নে যাবে বলছে।'

মাধবীলতা শুনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। হাসিমুখে এটা-সেটা বলতে বলতে সে প্রণাম করলো গুরুজনদের, একদম ছোটদের করলো আদর আর তারপর প্রভাতকে বললে, 'প্র্যামটা তুলে দেওয়া হয়ে গেছে নাকি?'

বিনা বাক্যব্যয়ে প্রভাত তিরিক্ষি মেজাজে বারান্দা থেকে পেরাম্বুলেটরটা ঠেলতে ঠেলতে বের করলো, তেতলা থেকে একতলায় গাড়ীটাকে সে একাই ঘষড়াতে ঘষড়াতে নামিয়ে এনে ঘোড়ার গাড়ীর মাথায় তুলে দিলো।

কিন্তু ফুলকাকীমার আর দেখা নেই! গাড়োয়ান তাড়া দিচ্ছে। প্রভাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে লাগলো।

মাধবীলতা ওদিকে আর এক ফেঁকড়া লাগিয়েছে। সন্ধে গড়িয়ে গেছে, তেতলা থেকে একতলা সিঁড়িটা অন্ধকার হয়ে গেছে সিঁড়িতে আলো না থাকার দরুন, মাধবীলতা বলছে অন্ধকার সে বড্ড ভয় করে, সিঁড়িতে একটা কিছু আলোর ব্যবস্থা না করলে সে নিচে নামতেই পারবে না। ফলে সুনয়নী আরেক দফা অগ্ন্যুদ্গার করছেন। হিরণ্ময়ী কালিঝুলিমাখা একটা হারিকেন কোত্থেকে খুঁজে-পেতে বের করেছেন, কিন্তু ফিতে কাটা নেই ব'লে এবং সামান্য খানিকটা কেরোসিন ওটার মধ্যে যা ছিলো সে-ও হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো ব'লে হারিকেনটা ধরাতে পারা যাচ্ছিলো না।

অবশেষে পাশের ভাড়াটের ঘর থেকে একটা টর্চ পাওয়া গেলো। শান্তিদেব স্বয়ং সেই টর্চ নিয়ে মাধবীলতাকে গাড়ীতে তুলে দিতে নিচে নেমে এলেন।

মাধবীলতা গাড়ীতে উঠবার আগে শান্তিদেবকে আর একবার প্রণাম করলো, বললো, 'দাদা, বি.এ. পরীক্ষেটা দিয়ে দেব ভাবছি, নয়তো ভালো একটা চাকরি-বাকরির সুবিধে হচ্ছে না। এ-বয়সে কলেজে ভর্তি হতে আর ইচ্ছে নেই, লজ্জা লাগে, ভাবছি আপনার কাছে এসে কয়েকটা মাস থেকে একটু তৈরী হয়ে নেব। আপনি আছেন প্রভাত আছে প্রতনু আছে, আমার আবার ভাবনা! তবে এখন না, কয়েকটা দিন পরে আসব, আপনারও তো এখন আই. এ. পরীক্ষার খাতা নিয়ে মরবারও ফুরসুত—'

প্রভাতের ধমক খেয়ে মাধবীলতা কথাটা শেষ না ক'রেই, হেসে উঠে, 'ওরে বাপ-রে ওরে বাপ-রে' করতে করতে গাড়ীতে উঠে বসলো।

প্রভাতকেও উঠতে হ'লো।

চললো গাড়ী।

'তুমি ডগ-সিটে বসেছো!'—মাধবীলতা ঠাট্টা করলো প্রভাতকে।

প্রভাত আমল দিলো না।

মাধবীলতা প্রভাতের মুখের দিকে কিছুক্ষণ কী দেখলো আর তারপর তরল হাসির ঢেউ তুলে বললো, 'তোমার গাড়ীর যা হাল দেখছি, বাড়ি পৌঁছতে কদ্দিন লাগে কে জানে। এর চাইতে প্র্যামটা নামিয়ে আমি তার মধ্যে চেপে বসি আর তুমি আমাকে ঠেলে নিয়ে চলো, তাতেও এই পুষ্পক রথের চে আগে যাওয়া যাবে বোধ হয়। খুঁজে-পেতে গাড়ী একটা এনেছো যা হোক!'

প্রভাত তবুও একটু তাকালো না ফুলকাকীমার দিকে, একটু হাসলো না, গাড়ীটা এ-কাত সে-কাতে চলতে চলতে ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর করতে করতে দু কদম এগোচ্ছে তো আড়াই কদম পিছিয়ে আসছে ব'লে মনে হতে থাকলেও সে গলা বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে পর্যন্ত কিছু বললো না—বিরক্তিতে রাগে সমস্ত মনটা তার তখন এমনি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। মনের সেই আগুনের তাপে চোখদুটো তার দৃষ্টিহীন নির্বোধ হয়ে গিয়েছিলো, পথের দিকে তাকিয়ে সে তখন নিজেকে একটি মারাত্মক প্রশ্ন করলো: ফুলকাকীমার সঙ্গে তার যে এই অভদ্র অসামাজিক আচরণ তার প্রকৃত অর্থ কী, সত্যিকারের তাৎপর্য কী।

'সবই বদলে যায়, সবই দেখি নষ্ট হয়ে যায়, আগে যা ছিলো তার চে' আরো ভালোর দিকে গেলো এমন আর কিছু দেখি না'—মাধবীলতা কথাগুলো বললো অনেকটা আত্মগতভাবে, মুখটা তার ইতিমধ্যে বিষণ্ণ শ্রান্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। এই কথাকটি বলবার আগে পর্যন্ত তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো প্রভাতের দিকে, তখন তার মুখে-চোখে রঙ ছিলো প্রাণময়তা ছিলো, কিন্তু ধীরে ধীরে সে-রঙ মুছে গিয়ে এখন সেখানে পরিব্যাপ্ত হয়েছে বাদুড়ের ডানা, দৃষ্টি চ'লে গেছে বাইরে দূরে অর্থহীন শূন্যতায়, কথায় লেগেছে করুণ আর্তি, সর্বোপরি এক ব্যর্থতা।

'এখন আর তুমি লেখো না?'—মাধবীলতা তেমনি ক্লান্ত গলাতেই প্রভাতকে জিগ্যেস করলো। বলতে লাগলো, 'লেখার চর্চাটা রাখলে পারতে। ওতে আর কিছু না হোক, মনের জ্বালা কমে, সমস্ত সংসার যখন মুখ ফিরিয়ে ব'সে থাকে তখন আড়ালে ব'সে একটু লিখতে পারলে অনেক অপমান দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা

দূর হয়ে যায়, বেশ ভুলে থাকা যায়। সে-লেখা লোকের যদি ভালো না লাগে পড়তে, তাতে কীই-বা এসে যায়, লোকের ভালো লাগানোর জন্যে লিখে কীই-বা লাভ। অবিশ্যি অনেকদিন আগে তোমার লেখা যা পড়েছিলুম আমি, তার মধ্যে ছেলেমানষি ছিলো বাড়াবাড়ি ছিলো। জীবনের তো তখনো কিছুই জানতে না তুমি, তাই ভাষাই তখনো পাওনি। কিন্তু তবু তোমাকে আমার কী ভালো লাগত, মনে হত তোমার একটা মন আছে। সমস্ত মানুষের তো মন থাকে না! সে-মন কি তোমার এখনো আছে? নাকি হারিয়ে ফেলেছো?'

প্রভাত চমকে উঠতে লাগলো মনে-মনে। যে-কথাগুলো সে শুনতে পাচ্ছে সে কি সত্যিই ফুলকাকীমা বলছে? না কি তার মনের মধ্যেই কথাগুলো প্রবল মন্থনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'লো? মুহূর্তে তার মনে পড়লো ফুলকাকীমার কবিতাগুলোর কথা, দুটি মোটা বাঁধানো খাতা বোঝাই নিটোল গোটা-গোটা অক্ষরে সেই ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস। সেই ফুলকাকীমার মুখে সাহিত্য সম্পর্কে, তার নিজের লেখা সম্পর্কে হঠাৎ এমন মন্তব্য শুনে সে আশ্চর্য হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ফুলকাকীমা সম্পর্কে কেমন একটা করুণাও জাগলো। ইচ্ছে হ'লো কিছু বলতে, কিন্তু কী বলবে তার কিছুই ভেবে পেলো না।

অনবরত চাবুক আর গালাগালি খেয়ে ঘোড়াদুটো ইতিমধ্যে কিছুটা চালু হয়েছে। সারাটা দিন কেটেছিলো গুমোট গরমে, সন্ধ্যার মুখেই সে-ভাবটা হালকা হয়ে গিয়েছিলো, এখন উদার প্রসন্ন হাওয়ায় ঘিঞ্জি মহানগরীর বিরক্তিকর ধোঁয়াধূলোর মধ্যেও চৈত্ররাতের মধুর মেজাজ বিস্তৃত হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষ রাত, আকাশময় তারাদের বৈঠক বসেছে ভাগে-ভাগে। যে-রাস্তা দিয়ে গাড়ীটা এগোচ্ছিলো সেটা অবিশ্যি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, বস্তি-অধ্যুষিত। 'আপনার সেই কবিতাগুলো কোথায়'—এই প্রশ্নটি প্রভাত করবে ভাবছিলো, কিন্তু তা করলেই আবার যদি তাল তোলে—কবিতাগুলো দিয়ে আমার একটা বই ছাপিয়ে দাও—তখন কী হবে! তার চাইতে অন্য কোন প্রসঙ্গ তোলা ভালো। এমন কোন প্রসঙ্গ যাতে ফুলকাকীমা খুশিও হবে আবার তারও কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কী বলা যায়? কী? 'সেতারটা যে কিনেছেন'—অবশেষে সে ব'লেই ফেললো ঝট ক'রে, 'রোজ বাজান নাকি?'

এত ভালোভাবে এমন কোমলভাবে প্রভাত তার সঙ্গে কথা বলবে এ বোধ হয় মাধবীলতা আদৌ আশা করেনি, প্রভাতের প্রশ্নটা শুনে তার দিকে সে বড়ো-বড়ো চোখদুটি মেলে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো। কিছুক্ষণ চুপ ক'রেই রইলো। তারপর হেলান দিয়ে ব'সে উদাস গলায় বললো, 'বাজাই, তবে হয় না।

আঙুল নড়তেই চায় না। সুর ভুলে গেছি। গৎগুলো একটাও আর ঠিকমতো তুলতে পারিনে। কী যে কান্না পায় না তখন। তাই ভাবি, জীবনের পরম ধন একবার যা পাওয়া যায় তাকে কখনো অবহেলা করতে নেই, ভুলে থাকতে নেই। জীবনে সুর আমি পেয়েছিলুম ভাই, কিন্তু রাখতে পারিনি, হারিয়ে গেছে। এখন কপাল কুটে মরছি, কিন্তু আর কি তা পাওয়া যাবে।'

প্রভাত বলার মতো আরো কিছু হাতড়াতে লাগলো।

একটু চুপ ক'রে থেকে মাধবীলতা প্রভাতের আসনের কোণে একটি পা তুলে দিয়ে বেশ যেন একটু আয়েশ ক'রে বসলো, বললো হালকা গলায়, 'তা হঠাৎ এ-কথা কেন ? আমার বাজনা শুনতে শখ হয়েছে নাকি ?'

প্রভাত হাসলো, অমায়িকতায়।

'আরে আরে মাংস ! এই গাড়োয়ান জেরা রোক্‌কো তো এক মিনিট কে লিয়ে, রোক্‌কো না'—মাধবীলতা চেঁচিয়েই উঠলো।

গাড়োয়ান ঘোড়াদুটোকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

'কী ব্যাপার ?'—প্রভাত অবাক হয়ে গিয়ে জিগ্যেস করে।

প্লাস্টিকের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে মাধবীলতা একটি পাঁচ টাকার নোট প্রভাতের হাতে দিয়ে বললো, 'যাও তো ভাই, ঐ যে মাংস, চট ক'রে সেরখানেক নিয়ে এসো তো ভালো দেখে।'

'ঐ গোরুর মাংস !'

'গোরুর ? ও কি গোরুর ? এ-মা গো ওয়াক, বমি আসচে আমার, এঃ কী দেখলাম। কিন্তু ভালো মাংস নেই এখানে ? ওটা তো বাজার। ভেতরে নিশ্চয়ই পাবে, যাও না ভাই নিয়ে এসো না একটু কষ্ট ক'রে। আজ কতদিন পরে তোমাকে পেলুম, আমি নিজে-হাতে রেঁধে খাওয়াব তোমাকে। যাও, যাও না'—প্রভাতের একটি হাত ধ'রে মাধবীলতা মিনতি করতে লাগলো।

কেশব সেন স্ট্রীট পার হয়ে গাড়ীটা তখন রাজাবাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। বাক্যব্যয় অর্থহীন হবে বুঝে প্রভাত নামলো গাড়ী থেকে, বিরক্ত পায়ে চ'লে গেলো বাজারের দিকে। মিনিট দশেক পরে ফিরে এলো শালপাতার ঠোঙায় আধসের মাংস নিয়ে। উদ্বৃত্ত পয়সা সে ফুলকাকীমাকে ফেরত দিলে না, নিজের কাছেই রেখে দিলো গাড়ীভাড়া বাবত।

গাড়ী চললো আবার।

আর সেই সঙ্গে চললো মাধবীলতার মুখখানা। আপনার মনে বিভোর হয়ে কত কথাই যে সে ব'লে যেতে লাগলো, অতীতের কত স্মৃতিচারণাই যে সে

করলো প্রভাতের কাছে। প্রভাত যে এ-সব কিছু শুনতে রাজী নয় তা বোঝার মতো অবস্থা মাধবীলতার তখন ছিলো না।

শুধু একটিবার প্রভাতকে মুখ খুলতে হ'লো। আর তাও বোধ করি জিভ থেকে উত্তরটা ফসকে বেরিয়ে গেলো ব'লেই।

মাধবীলতা প্রশ্ন করেছিলো, 'তোমার ফুলকাকার কোন খবর মাসখানেক পর্যন্ত কিছু পাচ্ছিনে। তুমি কিছু পাও? তোমার সঙ্গে দেখাটেখা হয় না?'

'হয়। রাস্তাঘাটে। কিন্তু চোখাচোখি হয়ে গেলেও আমি যে তাকে চিনি এরকম কোন ভাব দেখাই না।'

মাধবীলতা উত্তর শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো বাইরের দিকে তাকিয়ে। শেষে বললো মুখে বিষণ্ণ হাসি নিয়ে, 'তুমি ভুল করছো ভাই। ওঁর বাইরের আচরণ দিয়ে ওঁর ভেতরটা বিচার কোরো না। ওঁর অন্তঃকরণটা খুব মহৎ। কিন্তু জীবনের কোথাও জয়ী হতে পারেননি ব'লে বাইরের আচরণে উনি হীন হয়ে পড়েছেন। সেটা ওঁর দোষ কী। এ হবেই। হতে বাধ্য। এইটুকু অপরাধের জন্যে মানুষকে অত বড়ো সাজা দিতে চেও না ভাই। আমি জানি তুমি ভগবান মানো না, নিয়তি মানো না, কিন্তু'—মাধবীলতা মধুর হাসলো, 'আমি ভাই ও-সব মানি। সেই পরম করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমি হৃদয়ে অনুভব করি। যদিও বিপরীত তিনি ললিতে-কঠোরে! মানুষের জীবন দোলায়িত করছেন তিনি দুঃসহ দ্বন্দ্বে। কিন্তু তাই নিয়ে ভাই আমি কিন্তু কোনদিন ক্ষোভ করিনি। এই তো, মাসখানেক আগে তোমার ফুলকাকু এয়েছিলেন আমাদের বাড়ি। বিশ্বেস করো, আমার কোন অপরাধই ছিলো না, কিন্তু তবু, ব্যাপারটা না বুঝেই, আমার সব কথা না শুনেই, উনি আমাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলেন! কিন্তু আমি জানি, ওঁর ভুল ভাঙবে, উনি আবার আসবেন।'

'তা বটে!'—প্রভাত বললো, 'কিন্তু আমরা ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি কি? এই রাস্তাই তো? আপনি চেনেন তো ঠিক?'

মাধবীলতা বাইরে গলা বাড়িয়ে রাস্তা দেখলো, কিন্তু প্রভাত বেশ বুঝতে পারলো যে কিছুই ফুলকাকীমার মালুম হচ্ছে না।

'চড়কডাঙা চেনে না, কীর'ম গাড়োয়ান!'—ব'লেই মাধবীলতা চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই গাড়োয়ান, তুম চড়কডাঙা পচন্‌তে নহী?'

'হাঁ হাঁ জরুর'—গাড়োয়ানের সাড়া এলো।

'তবে? ও তো চেনে'—ব'লেই মাধবীলতা হেসে উঠলো খিলখিলিয়ে,

বললো চোখ পিটপিট ক'রে, 'আসলে তুমিই কিছু চেনো না! বুদ্ধু হ্যায়! একদম আনাড়ী হ্যায়'—ব'লে মাধবীলতা প্রভাতের থুতনিটা ধ'রে নেড়ে দিলো।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, চড়কডাঙার মধ্যে এসে গাড়ী অতঃপর কোন্ গলিতে ঢুকবে তা মাধবীলতা কিছুতেই দিশে ক'রে উঠতে পারলো না। এই নিয়ে গাড়োয়ান শেষ পর্যন্ত খিচখিচ শুরু ক'রে দিলো। আর প্রভাত তো সপ্তমে চ'ড়ে ছিলোই। অবশেষে প্রভাত ফুলকাকীমার কাছ থেকে রাস্তার নাম আর বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিয়ে, রাস্তার লোকের সাহায্যে, ঠিক গলি এবং ঠিক বাড়িটি অনেক কষ্টে বের করতে পারলো।

পেরাম্বুলেটরটা নামিয়ে দিয়েই গাড়োয়ান ভাড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মাধবীলতা তখন দরজার কড়া নাড়ছে।

প্রভাত বললো, 'গাড়ীভাড়ার জন্যে তিন টাকা বারো আনা আছে আমার কাছে, আরো পাঁচ সিকে লাগবে।'

'পাঁচ সিকে? ঠিক আছে, আমার কাছে নেই, দরজা খুলুক মা তারপর দিচ্ছি'—বলতে বলতে মাধবীলতা কড়াটা নাড়তে লাগলো যেন গায়ের সমস্ত শক্তিতে।

কিন্তু কে বলবে এ-বাড়িতে জনপ্রাণীর অস্তিত্ব আছে! মিনিটের পর মিনিট অতিক্রান্ত হতে থাকে, কিন্তু না একতলা কি দোতলার বন্ধ জানালাগুলো খুললো, না সদর দরজা খোলার কোন লক্ষণ বোঝা গেলো।

'এ আর কিছু না বুঝলে, এ আমাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে! নিজের মা হ'লে হবে কী ভাই, আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। আমি হচ্ছি সকলের দু-চক্ষের বিষ!'

প্রভাত ছিটকে স'রে যায় গাড়োয়ানের কাছে, যে ইতিমধ্যে হাঁকডাক ক'রে সেখানে ছোটখাটো একটা জটলাই সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে।

অগত্যা নিজের পকেট থেকেই টাকাটা পুরিয়ে সে ভাড়া মিটিয়ে দিলো। গাড়োয়ানকে বিদায় ক'রে দিয়ে প্রভাত নিজেও এবার সটকে পড়বে কিনা ভাবে।

'ও প্রভাত এসো, খুলেছে দোর। এসো বাঃ দাঁড়িয়ে কেন ওখানে? কী মতলব আঁটছো গো মনে-মনে?'—মাধবীলতা খপ ক'রে গিয়ে চেপে ধরলো প্রভাতের একটা হাত, বললো ঘন গলায়, 'ছি প্রভাত, ফুলকাকীমাকে এমন ক'রে দুঃখ দেয় না! কত সাধ ক'রে মাংস নিয়ে এলুম, না খেয়ে যদি পালাও তো সে-দুঃখ আমার সমস্ত জীবনেও যাবে না ভাই। আচ্ছা দাঁড়াও, উঃ কী অন্ধকার,

কতদিন বলেছি মা নিচে প্যাসেজে একটা বালব লাগাও তা কিপটেমি ক'রে বাড়িটাকে একেবারে প্রেতপুরী ক'রে রেখেছো।'

'চাবিটা দে না আমাকে'—বললেন মাধবীলতার মা কিরণবালা, 'খুলে দিচ্ছি দোর, তোর যক্ষের ধন খেয়ে ফেলব না। আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবি পরের বাড়ির ছেলেকে এই অন্ধকারের মধ্যে।'

'যথেষ্ট মা যথেষ্ট! যথেষ্ট বলেছো!'—বলতে বলতে এতক্ষণে মাধবীলতা নিচের একটি ঘরের দরজার তালা খুলতে পারলো, ভেতরে ঢুকে স্যুইচ টিপে আলো জেলে ডাক দিলো প্রভাতকে, 'কই গো, প্র্যামটা নিয়ে এসো না চটপট। প্রভাত? ও প্রভাত?'

পেরাম্বুলেটরটা ভেতরে ঢোকাতে গিয়ে ছোট্ট ঘরখানার অবস্থাটি দেখে প্রভাতের চক্ষু চড়কগাছ হ'লো। ঘরটার মধ্যে রাজ্যের জিনিসপত্র একটার ঘাড়ে আরেকটা এমন অদ্ভুতভাবে স্তূপীকৃত ক'রে রাখা হয়েছে যে একে গুদামঘর বললেও কম বলা হয়।

'কী দেখছো গো অমন চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে? ডাকাতির মতলব, না? যাও বাপু, বেরোও তো এবারে, আর দেখে না।'

ঘরের দরজায় আবার তালাচাবি পড়লো।

'প্রভাত, তোমার কথা অনেক শুনেছি, আজ তোমাকে দেখলুম'—বললেন কিরণবালা, 'তা গরীবের বাড়িতে যদি এলেই, চলো ওপরে, খেয়েদেয়ে তারপর যাবে।'

খেয়াল হ'লো প্রভাতের এঁকে একটা প্রণাম করা দরকার। প্রণাম করতেই কিরণবালা ধরা গলায় বললেন, 'সুখী হও বাবা সুখী হও। চলো ওপরে চলো, তোমার মুখখানা দেখি একটু। একে আঁধার তায় বুড়ো হয়েছি, চোখে কিছু কি আর ছাই আছে যে দেখব ভগমান সে-উপায় আর রাখেনি কো। আহা তোমাদের মতো ছেলেকে চোখের দেখা দেখলেও পুণ্যি হয় গো, নয়ন সাত্থক হয়। কিন্তু হ'লে কী হবে, সবই অদেষ্ট, সবই অদেষ্ট। পোড়াকপালীর কপালে—'

মাধবীলতা খিলখিলিয়ে হেসে উঠতেই কিরণবালা স্তব্ধ হলেন।

বললো মাধবীলতা, 'ওমা তোমার মেয়ের অদৃষ্টে করলা ভাতে, বিচি কচকচ করে। তা কপাল কুটে কী আর করবে বলো। বেচারী বাড়িতে পা দিতে না দিতেই এমন কাঁদুনি গাইতে শুরু ক'রে দিলে, কী ও ভাবছে বলো তো। এসো বাছা, তুমি ওপরে চলে এসো তো আমার পেছন-পেছন, ও-সবে কান দিও না তুমি।'

প্রভাত নড়বার কোন লক্ষণ দেখালো না।

কিরণবালা তাড়াতাড়ি কাছে এসে প্রভাতের একটি হাত জড়িয়ে ধ'রে মাধবীলতা শুনতে না পায় এমনি নিচু গলায় বললেন, 'চলো বাবা ওপরে চলো, তোমার সাথে আমার একটা পেরাইবেট কথা আছে'—ব'লেই গলা চড়িয়ে মাধবীলতাকে শুনিয়ে বললেন, 'মেয়ে নিজে হাতে রেঁদে তোমাকে খাওয়াবে ব'লে সাধ ক'রে মাংস নিয়ে এয়েছে···তুই যা না মাধি, গিয়ে মাংসটা ধুয়ে-পাখলে সব যোগাড়যন্তর কর না, আমি প্রেভাতকে নিয়ে গে তোর ঘরে বসাচ্ছি।'

মাধবীলতা সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ব'লে গেলো, 'কানে ফুস-মন্তর ঝাড়বে বুঝি? তা ঝাড়ো কিন্তু হতভাগী তিনটে গেলো কোথায়? সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে যে?'

'তবু ভালো যে মনে পড়লো তাদের কথা! ডেকে খপর নিচ্ছিস। সেই দুকুর থেকে পরা কেঁদে হেদিয়ে একশা! দুধের শিশু, তার অপরাধই বা কী। শেষ পরে, নিখিল আপিস থেকে ফিরে এলে তবে ছিষ্টি ঠাণ্ডা হ'লো, সে ইরা-ধীরা-পরা তিনটেকেই একটু হাওয়া খাইয়ে আনতে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, বৌমা এসে বললে আমিও একটু ঘুরে আসি মা? বৌমা আমার লক্ষ্মী, তোর মতো অলক্ষ্মী তো আর না, তো আমি বললুম, যাও না মা যাও, একটু ঘুরে আসবে তার জন্যে আবার অত হুকুম নেওয়া-নেয়ি কেন—'

'আমি বরং একটু ঘুরে আসি'—প্রভাত বাধা দিয়ে বললো, 'কাছেই এক বন্ধুর বাসা আছে, একটা দরকার সেরে আসি।'

'সে কী বাবা···ও মাধী, প্রেভাত কী বলছে শোন।'

'কী বলছো গো?'—মাধবীলতা সিঁড়ি থেকেই জিগ্যেস করলো।

'আমি একটা কাজ সেরে তারপর আসছি। এই তো যাবো আর আসবো।'

'তা বেশ তো যাও না, কিন্তু বেশী দেরী কোরো না যেন লক্ষ্মীটি।'

'না দেরী হবে না।'

'ফুলকাকীমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছো কিন্তু?'

'আচ্ছা'—ব'লেই প্রভাত পেছন ফিরলো, দরজা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিলো, কিন্তু পেছনে চাপা গলায় ডাক শুনে আবার ফিরে দাঁড়াতে হ'লো, দেখলো কিরণবালা তার পেছন পেছন রাস্তায় চ'লে এসেছেন।

রাস্তার গ্যাসের আলোতে এবার প্রভাত ফুলকাকীমার মা'র চেহারাটা আগের চেয়ে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেলো। দেখে তার মনে হ'লো, এঁরও

চোখদুটি ফুলকাকীমার মতোই বড়ো-বড়ো, অস্বাভাবিক, সন্ত্রস্ত, বিষণ্ণ এবং হয়তো-বা, প্রভাতের মনে হলো, বিকারগ্রস্তও।

কিরণবালা ফিসফিস ক'রে উর্ধ্বশ্বাসে বললেন, 'বাবা, চুপিচুপি একটা পরামর্শ দিয়ে যাও। লোকে বিপত্তে মধুসূদনকে ডাকে, আমি এমন পোড়াকপালী আমাতে তিনিও বিমুখ, ডেকে ডেকে এখন হাল ছেড়ে দিইছি বাবা। এমন সোনার সংসার তোমাদের, একমাত্র মেয়ে আমার তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে কত আনন্দ হয়েছেলো সকলের আহা মেয়ের আমার বরাত ফিরে গেলো। কিন্তু হলে কি হবে, কপাল যে সঙ্গে সঙ্গে যায়। হ্যাঁ বাবা, তোমাকে একটা কথা বলে দেব তোমার ঠাকুরমাকে একটু বলবে বুঝিয়ে?'

প্রভাত অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলো ফুলকাকীমার মার সঙ্গে এমনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে। তার মনে হচ্ছিলো আশেপাশে যারা আছে তাদের সকলেরই দৃষ্টিটা তাদের দিকে,তাছাড়া যে-কোন মুহূর্তে ফুলকাকীমার ভাই নিখিল ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে এসে পড়তে পারে যেটা এই মুহূর্তে প্রভাত আদৌ পছন্দ করছিলো না।

'তোমার ওপর ওর কী যে টান বাবা'—কিরণবালা ফের বললেন, 'অষ্টপহর শুদ্ধু তোমাদের কথা, পঞ্চমুখে। আর হবে নাই বা কেন বলো, বিয়ে হয়েছে তিন তিনটে মেয়ে হয়েছে শ্বশুরবাড়ির দিকে মন হবে না? তাই বলছি বাবা, তোমার ঠাকুরমার হাতে পায়ে ধ'রে বলছি—ক্ষেমা ঘেন্না ক'রে গলগ্রহটাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিন। জানি বাবা, মেয়ের আমার অশেষ দোষ কিন্তু তাই ব'লে কি তোমরা তাকে ফেলতে পারো। পাড়ার লোকেরা বলে পাগলা গারদে দিন! বলবে না? একশোবার বলবে। দিনরাত কী কাণ্ডটা করে, তারা পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে অষ্টপহর। তাদের আর দোষ কী বলো। কিন্তু কেন? কেন? সেটাও ছাখো বিচার বিবেচনা ক'রে। আহা ও যে বড় দুঃখী। ওর বুকে যে রাবণের চিতে। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে যে আবাগী। তোমার কাকাবাবু যে বড়ো দুব্যবহার করে হতভাগীর সাথে। কী পাষাণ বাপ, মেয়েগুলোর দিকে পয্যন্ত একটু তাকায় না। হায় ভগমান! কেন এমন হ'লো, কেন এমন হ'লো—'

'আচ্ছা আমি তো আবার আসছি ঘুরে'—ব'লেই প্রভাত রওনা হ'লো।

কিরণবালা অসহায়ের মতো বললেন, 'আসবে তো বাবা? এসো, এসো কিন্তু।'

'হ্যাঁ ঠিক আসব'—হাত তুলে আশ্বাস দিয়ে প্রভাত হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করলো আর একবারও পেছনে না তাকিয়ে।

৩

পেছনে তাকানোর সাহস হ'লো তার গলিটা পেরিয়ে গিয়ে বড়ো-রাস্তায় প'ড়ে। আর একমাত্র তখনই, নিজের মতো ক'রে কিছু ভাববার মানসিক অবস্থা সে আয়ত্ত করতে পারলো।

এবং তখন, প্রথমেই সে হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হ'লো এই মনে ক'রে যে যে-বিপদ থেকে সে উদ্ধার পেয়ে এলো সেই-বিপদের মধ্যে আবার গিয়ে পড়া না-পড়া এখন তার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছে করলে সে এই পথে আর জীবনেও না ফিরতে পারে, ফুলকাকীমার নিমন্ত্রণ আর তাঁর মার অমন করুণ মিনতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে সে যদি সোজা এখন বাড়িতে কি অন্য কোথাও চ'লে যায়, তবে একটু আগেও যে সে কেমন একটা অদ্ভুত অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিলো তা আর তাকে পড়তে হয় না।

কর্তব্য সৌজন্য ভদ্রতা, মন হৃদয় বিবেক ইত্যাদি প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি আমাকে হতে হচ্ছে কি, সেক্ষেত্রে? এক উন্মাদ ভদ্রমহিলা, হতে পারে তিনি সম্পর্কে আমার কাকীমা এবং তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন, কিন্তু তাই ব'লে বিকারের ঘোরে মাংস কিনে নিয়ে এসে তাই আবার নিজে-হাতে রান্না ক'রে আমাকে খাওয়ানোর শখ যদি তাঁর চেপেই থাকে, সেই উদ্ভট শখ মেটাতে আমি রাজী না থাকলে কি আমাকে বিবেকের প্রশ্নে ফেলা হবে? ফুলকাকীমার মা, যাঁকে কথাবার্তা শুনে মনে হলো অত্যন্ত ভালোমানুষ অত্যন্ত অসহায় এক বৃদ্ধা, তাঁর আর্তি আর কাতর প্রার্থনা যদি আমার হৃদয় স্পর্শ না ক'রে থাকে তাহ'লে কি আমাকে হৃদয়হীনতার দায়ে ফেলা হবে? কেন?

মনে পড়লো ভূমিত্রীর কথা। তার জীবনটাও তো অভিশপ্ত। ফুলকাকু যেরকম নীচ প্রকৃতির মানুষ, ভূমিত্রীর স্বামী সম্ভবত তেমনি ধরনেরই একজন হবে এবং আমার ঠাকমাটি যেমন বউকাঁটকী, ওর শাশুড়ীও তাই এবং বিবাহিত জীবনে আরো যে-সব কারণ একটা সুস্থ মানুষকে পাগল ক'রে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, ভূমিত্রীর এক বছরের বিবাহিত জীবনে সেরকম কারণ তো প্রচুর ঘটেছিলো। কিন্তু তবু তো ভূমিত্রী পাগল হয়নি? সে স্বামী-শ্বশুরবাড়ি জলাঞ্জলি দিয়ে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু পাগল হয়নি। এবং যতদিন সে তা না হবে, শুদ্ধ

ততদিন পর্যন্তই কর্তব্য সৌজন্য ভদ্রতা, মন হৃদয় বিবেক ইত্যাদির সম্পর্কগুলি তার সঙ্গে বজায় রাখবার প্রশ্ন থাকবে। কিন্তু যদি সে কোনদিন বিকারে আচ্ছন্ন হয়, তার চালচলন কথাবার্তা যদি কখনো খাপছাড়া অস্বাভাবিক হয়ে যায় তাহ'লে সেদিন আমার কাছে তার সমাদর তার নিমন্ত্রণের কোন মূল্য থাকবে কি।

অবিশ্যি পার্থক্য আছে দুজনের মধ্যে, ফুলকাকীমা আর ভূমিত্রীকে একই ধরনে বিচার করবার কোন মানে হয় না। এমনও তো হতে পারে ফুলকাকীমার অবস্থায় পড়লে ভূমিত্রীর পক্ষেও মনের ভারসাম্য আর সামাজিক সুস্থতা বজায় রাখা অসম্ভব হত। তাছাড়া মাত্র ছ'মাসের পরিচয়ে ভূমিত্রীর সম্বন্ধে কতটুকুই বা আমি জানি। আচ্ছা কটা বাজে এখন ?

রাস্তার এক দোকানের ঘড়িতে আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। এদিককার এই বাসগুলো যায় কোথায় ?

এ-অঞ্চলে প্রভাত এর আগে কখনো আসেনি। একটি পান-বিড়ির দোকান থেকে সে তথ্যটা জেনে নিলো। জেনে খুশি হলো যে এ-রাস্তার যে-কোন বাস শেয়ালদা যাবে। তার এখন তাই দরকার। ভূমিত্রীর বাসা শেয়ালদার কাছেই, সার্পেন্টাইন লেনে। পরবর্তী বাসটাতেই সে উঠে পড়লো।

একই আপিসের সহকর্মিণী হলেও—প্রভাত আবার সেই একই চিন্তায় মগ্ন হ'লো—ভূমিত্রীর প্রকৃত ইতিহাস এখনো হয়তো আমি কিছুই জানি না। আমাদের আপিসে চাকরিতে ঢুকেছে সে বছরখানেক আগে, আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো এই মাস ছয়েক আগে, সে-পরিচয় ক্রমে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে, হৃদ্যতার সুর লেগেছে কথাবার্তায়, ফলে আপিসের কেরানীমহলে আমাদের মেশামেশির তাৎপর্য নিয়ে ক্রমে এমনি-সব কানাঘুষো প্রবল হয়ে উঠলো যে আপিসে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলা একরকম ছেড়েই দিতে হ'লো। একসঙ্গে ক্যান্টিনে টিফিন করা পর্যন্ত বন্ধ করতে হ'লো। ফলে গত মাস-দুই দেখাসাক্ষাৎটা ভূমিত্রীর বাসাতেই গিয়ে করতে হচ্ছে। ওর বাড়ির অন্যান্যরাও আমাকে অপছন্দ করে না। অনেক কিছুই ওদের জেনেছি। কিন্তু আশ্চর্য, ওর স্বামী-শাশুড়ী শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে ভূমিত্রী আজো পর্যন্ত আমাকে বিশেষ কোন-কিছুই তো বলে না ? ওর এ-সব কাহিনী ওদের বাড়ির কারো মুখেই আমি শুনিনি। শুনেছি আপিসে, এর-তার মুখে, জল্পনা-কল্পনায়, কানাঘুষোয়, হাওয়ায় ভেসে-আসা কথায়। আশ্চর্য, যারা এ-সব খবর ছড়ালো তারা তা কোথা থেকে পায়। অত-সব কেচ্ছা আর ভেতরের খবর কে তাদের জানালো ?

ভূমিত্রী নিজে নিশ্চয়ই না। একেই সে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির, মিশুক সে একেবারেই না, তা-ছাড়া যে-সব পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে সে কথাবার্তা বলে বা মেশে তাদের কারো কাছে নিজের জীবনের এই বিশ্রী খবরগুলো সে নিজে-মুখে দিয়েছে এ-কথা অবিশ্বাস্য। অবিশ্যি প্রকাণ্ড সওদাগরী আপিস, মেয়ে-কেরানী তো আরও কয়েকজন আছে! সুতরাং পুরুষ কেরানীদের যান্ত্রিক কানের টেলি-প্রিণ্টারে খবর ধরা পড়তে বাধা কী!

'দিদি তো বাড়ি নেই। আসুন না বসবেন? এখনই আসবে নিশ্চয়ই'—সদর দরজা খুলে ভূমিত্রীর ছোটবোন চোদ্দ বছরের ফ্রক-পরা মেয়ে গায়ত্রী বললো।

'না থাক তাহ'লে আর একদিন আসব 'খন'—প্রভাত ফিরলো, পা বাড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বললো, 'আজ অঙ্ক না কবিতা?'

'যান ভালো হবে না বলছি'—গায়ত্রী চেঁচিয়েমেচিয়ে বললো।

হা-হা ক'রে প্রভাত হেসে উঠলো। তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়ে নকল ত্রাসে বললো, 'ওরে বাবা, তাহ'লে আজ নির্ঘাৎ অঙ্ক!'

'আচ্ছা!'—গায়ত্রী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

আর একবার হাসির রোল তুলে প্রভাত এগুলো।

গলির বাঁক ঘুরে খানিকটা যেতেই ভূমিত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো।

'আরে আপনি?'—ভূমিত্রী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'আপনার কাছেই এসেছিলাম। না পেয়ে ফিরে যাচ্ছি।'

'আপনার যেমন বুদ্ধি! বসতে কী হয়েছিলো একটু। চলুন।'

'থাক আর আজ। আপনি বোধ হয় ক্লান্ত।'

এর উত্তরে ভূমিত্রীর মুখে যে মুদ্রাটি ফুটে উঠলো বরিশালে তাকে বলা হয় ভ্যাটকানো, কিন্তু প্রভাত বেচারী মুর্শিদাবাদের মানুষ, বরিশালের মেয়ে ভূমিত্রীর মুখের এমন নৈকষ্য বরিশালী মুদ্রাটির সংজ্ঞা নির্ণয় করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'লো।

'কী? যাবেন না?'—ভূমিত্রী বললো।

'বাড়িতে আর না গেলাম, পার্কে না হয় বসা যেতে পারে।'

'তাই চলুন।'

কাছেই সেণ্ট জেমস স্কোয়ার। এক বেঞ্চিতে গিয়ে দুজনে বসলো। বেঞ্চিটাতে আরো দুজন লোক বসেছিলো। খালি বেঞ্চি সমস্ত পার্কটিতে একটিও খুঁজে না পেয়ে শেষে ওরা ওখানে গিয়ে বসেছে। লোক দুটি কথাবার্তা বলছিলো না, ওরা বসতে দুজনেই একটু স'রে বসলো।

'কী ? চুপচাপ যে ?'—ভূমিত্রী বললো।

প্রভাত ভাবছিলো, আচ্ছা এই লোকদুটো ব'সে থাকবার জন্যে কোন কথাবার্তা বলতে আমার অস্বস্তি লাগছে—কিন্তু আপিসের এই সহকর্মিণী ভূমিত্রীর বদলে যদি কোন সহকর্মীকে নিয়ে এসে বসতাম এখানে তাহ'লে ওদের উপস্থিতি কি আমার মুখ বন্ধ ক'রে রাখত ?

ভূমিত্রী প্রভাতের সমস্যাটা বুঝতে পারছিলো। বললো, 'চলুন না নেমে মাটি:তে গিয়ে বসি।'

উঠবারও কোন লক্ষণ দেখালো না প্রভাত।

মৃদু গলা-খাঁকরি দিয়ে একটি লোক উঠে চ'লে গেলো।

সেখানকার আবছা আলোতেও ভূমিত্রী দেখে স্পষ্টই বুঝলো প্রভাতের মুখখানা থমথমে হয়ে উঠলো।

আরো কিছুক্ষণ এমনি কেটে গেলো, নীরবে। তখন অন্য লোকটিও উঠলো। কিন্তু উঠেই ফের ব'সে পড়লো, একটা পা তুলে দু-হাতে সেটা চেপে ধরলো। ঝিঁঝি লেগেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভূমিত্রীর ভয়ানক হাসি পেলো। লোকটি কিছুক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টা করলো চটপট ঝিঁঝিটা নামিয়ে দেবার, নামলো কিনা সে-ই জানে, বেচারী উঠে প'ড়ে লেংচাতে লেংচাতে চ'লে গেলো।

প্রভাত ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো ভূমিত্রী কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে-ফুলে উঠছে। কী ব্যাপার ? অবাক হয়ে সে ভাবলো—হঠাৎ ওর এত হাসি পাবার কী হয়েছে।

'নিন স'রে বসুন নয়তো আবার কেউ এসে জুড়ে বসবে'—বললো ভূমিত্রী মুখ তুলে।

'যত্ত সব বাজে'—প্রভাত বললো বেশ ছড়িয়ে ব'সে, 'আমি এখন এখানে ব'সে আছি তো, অথচ আমার জন্য একজন মাংস রেঁধে অপেক্ষা করছে !'

'সে কী মশাই, বেশ তো লোক আপনি অ্যাঁ! চলুন চলুন আমাকেও নিয়ে চলুন সেখানে, একটু চেখে আসি।'

প্রভাত হাসলো না।

ভূমিত্রী তখন গম্ভীর হয়ে বললো, 'কে ? নাম কী তার ? তো অপেক্ষায় আছে তো যাচ্ছেন না কেন ?'

'যাব না তাই। সেই যে ফুলকাকীমার কথা বলেছিলাম না, তিনি।'

'যাবেন না কেন ?'

'ফুলকাকীমা পাগল তা তো বলেছি আপনাকে।'



'তা তো বলেছেন কিন্তু হঠাৎ তিনি আপনার জন্যে মাংস রাঁধতে গেলেন কেন।'

প্রভাত তখন মাংসের কাহিনীটা বললো। কথাটা সে সংক্ষেপে গুছিয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলতে পারলো না। প্রত্যেকটি কথা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টায়, ফুলকাকীমার কার্যকলাপ, তার নিজের আচরণ, অন্যান্য সকলের আচরণের প্রকৃত তাৎপর্য ভূমিত্রীকে নির্ভুলভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টায় তার বিবৃতি দীর্ঘ, এলোমেলো, ক্লান্তিকর হ'লো।

'আমার কিন্তু ওঁকে পাগল মনে হয় না। কথাবার্তা একটু অস্বাভাবিক ঠিকই, কিন্তু তাই জন্যেই কি কাউকে পাগল বলা চলে?'—সমস্ত শোনার পর ভূমিত্রী মন্তব্য করলো।

'চলে'—প্রভাত অসহিষ্ণু গলায় উত্তর দিলো।

ভূমিত্রী একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনার ওপর ওঁর এত টান কেন?'

'টান?'—ব'লে প্রভাত অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললো, 'আচ্ছা আর একদিন বলব 'খন। আজ বোধ হয় অনেক রাত হয়ে গেছে।'

ভূমিত্রী হাত উল্টে ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার জন্যে যতটুকু আলো দরকার সেখানে তা ছিলো না।

'কি জানি বুঝতে পারছি না, সাড়ে নটা মতো হবে মনে হয়।'

'ঐ আলোতে গিয়ে দেখে আসুন না'—প্রভাত কাছের গ্যাসপোস্টটা দেখালো।

'বাড়ি ফিরবার এত তাড়া কেন? সেখানে আপনার জন্যে মাংস রেঁধে কেউ ব'সে নেই ব'লে?'

প্রভাত এ-কথার অর্থ বুঝলো না।

'ফুলকাকীমার কথা যতটুকু বলেছি আপনাকে'—প্রভাত বিনা ভূমিকায় ফের শুরু ক'রে দিলো, 'তাতেই অবিশ্যি আপনার বুঝতে পারা উচিত যে দিনের পর দিন অত্যাচার আর অপমানে-অপমানেই সে পাগল হয়ে গেছে। এর জন্যে দায়ী অনেকেই, কিন্তু মূলে আছেন আমার অদ্ভুত ঠাকমাটি এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র স্বয়ং আমার ফুলকাকু। অথচ বিয়ের আগে ওঁদের মধ্যে কিন্তু জানাশোনা ছিলো। শুনেছি সাত-আট বছর পর্যন্ত তাঁদের ইয়ে হয়েছিলো। বিয়েতে বাধা হচ্ছিলো এই কারণে যে, আমার এক কাকা শাসিয়েছিলেন আমাদের কুলীনের ঘরে ঐ বাঙাল মেয়েকে এনে যদি কুল নষ্ট করা হয় তাহ'লে তিনি ভয়ানক কাণ্ড করবেন।

করেওছিলেন, তিনি নিজে আমাদের দেশের বাড়িতে থাকতেন না—কলকাতায় মেসে থেকে চাকরি করতেন, বৌ-ছেলেমেয়েরা থাকত দাদু-ঠাকমার সঙ্গে দেশের বাড়িতে। কিন্তু যেই শুনলেন ফুলকাকু ঐ মেয়েকেই বিয়ে ক'রে দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছেন অমনি উনি গিয়ে বৌ-ছেলেমেয়ে সমস্ত শ্বশুরবাড়িতে রেখে এলেন, জানিয়ে দিলেন সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেলো তাঁর এ-পরিবারের সঙ্গে। দাদু-ঠাকমারও এ-বিয়েতে ভয়ানক আপত্তি ছিলো। বাঙাল সে তো একটা কারণ বটেই, তাছাড়া বাপ গরীব, দেবে-থোবে না কিছুই। অবিশ্যি তাঁরা ফুলকাকীমাকে নিজেদের কাছে রাখতে গররাজী হননি। বিয়ে যখন ক'রেই ফেলেছে ছেলে, এসে যখন জোড়ে প্রণাম করলো, দাদু অবিশ্যি মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, কিন্তু এ-কথা বলেননি যে তোমার স্ত্রীর এ-বাড়িতে স্থান হবে না। ফুলকাকু ফুলকাকীমাকে রেখে কলকাতা চ'লে এলেন। তিনি তো বিজনেস করতেন। করতেন মানে এখনো তাই করেন। টিম্বার মার্চেণ্ট! এক হিসেবে, বিজনেসম্যান হিসেবে তিনি খুব উচ্চ শ্রেণীর। কারণ তিনি ব্যবসার মূলধন সংগ্রহ করেন অন্যের মাথায় হাত বুলিয়ে। নতুন নতুন মাথা, অর্থাৎ নিত্য নতুন শাঁসালো বন্ধু জোটানোর এবং তাদের পটানোর এবং তাদের একদম পথে বসানোর এমন অদ্ভুত ক্ষমতা ভদ্রলোকের আছে যে সে আপনি ধারণা—যাকগে এ-কথা থাক আজ, আর একদিন বলব 'খন। যা জিগ্যেস করছিলেন—ফুলকাকীমার আমার ওপর এত টান কেন। কেন তা বলা মুশকিল, তবে এ-কথা বলা যেতে পারে যে তাঁর বিয়ের পরে আমাদের বাড়িতে আমি আর দিদিই ছিলাম তাঁর একমাত্র আশ্রয়। আমাদের কাছে এসে উনি কাঁদতেন, লুকিয়ে-লুকিয়ে। মনের কথা বলতেন। মনে আছে, তখন আমরা স্কুলে পড়ি, এই সেভেন-এইট হবে। চিলেকোঠায় ব'সে আমি আর দিদি পড়ার নামে গুলতানি করতাম। রান্নার ফাঁকে-ফাঁকে, রান্নাঘর থেকে উনি পালিয়ে আসতেন আমাদের কাছে। বেশীক্ষণ বসতেন না কখনো, কান খাড়া ক'রে অধিকাংশ সময়ই চুপচাপ ব'সে থাকতেন, আর যা-ই নিচে থেকে ঠাকমার হাঁক-চিৎকার আসত 'ছোটো-বউ' 'অ ছোট-বউ' ব'লে, অমনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতেন নিচে। ব্বাপরে-বাপ, সে কী বাজখাঁই চিৎকার দিনরাত। দেশের বাড়িতে আমাদের পুকুর ছিলো, সেই পুকুরপাড় থেকে ঠাকমা চেঁচাতেন তাও শোনা যেত চিলেকোঠা থেকে এমনি ছিলো ঠাকমার গলার জোর। একদিন সকালবেলার কথা মনে পড়ে, আমি আর দিদি ব'সে আছি চিলেকোঠায় ফুলকাকীমা এসে হাজির। তাঁর সেদিনকার সেই মুখখানা আমি হয়তো জীবনেও ভুলতে পারব না। দাদু ঠাকমার হাজার

অত্যাচারেও, দু-চোখে মুখ ভাসানো জলের ধারা বয়ে গেলেও, ফুলকাকীমার মুখে কিন্তু কোনরকম বিকৃতি দেখতাম না, বরং মুখে কেমন শান্ত সহনশীলতার একটা হাসিই ফুটে থাকত, কিন্তু সেদিন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিলো সর্বনাশা দুঃখের চিহ্ন, দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। জিগ্যেস করলাম, কী হয়েছে ফুলকাকীমা? উনি বললেন, আমাকে ওঁরা যা-খুশি বলুন না, কিন্তু আমার বাবা-মা'র সম্বন্ধে মন্দ কথা বললে আমার বড়ো কষ্ট হয়। আর এ-সব ব'লে ওঁদেরই বা কী লাভ। আজকে বললেন তোমাদের ঠাকমা, আমার মা নাকি পাগল আর বাবা নাকি ভিক্ষে ক'রে আমাদের সংসার চালান! ফুলকাকীমা পাগল হয়ে যাবার পরে, শুধু দাদু-ঠাকমার মুখেই না, অনেকের মুখেই শুনেছি ওঁর মা-ও নাকি পাগল, দিদিমাও পাগল ছিলেন অর্থাৎ এ পাগলামি বংশানুক্রমিক! প্রকৃতপক্ষে আমিও কিন্তু এটা বিশ্বাসই করতাম। কিন্তু আজ তো ওঁর মা-কে দেখলাম, পাগলামির কিছু তো বুঝলাম না।'

'যতই বলুন, নিষ্ঠুরতায় আপনিও কম যান না'—ভূমিত্রী টিপ্পনী কাটলো।

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ আবার কী, আপনার মতো সব কিছুরই অর্থ বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা কি সকলের থাকে। কিন্তু আপনিই নিজের মতিগতির অর্থটা আমাকে বুঝিয়ে দিন তো—আপনাকে এক বাড়িতে আদর ক'রে নেমন্তন করা হয়েছে, সে নেমন্তন্ন আপনি রাখবেন না অথচ কথা দিয়ে এসেছেন তাদের। মিছিমিছি বেচারীদের ভোগান্তি। এর অর্থটা একটু ব্যাখ্যা করুন না। আপনার ঠাকুমার অত্যাচারের চাইতে আপনার অত্যাচারটা কম কিসে? আমি তো বলি, আপনার কাকীমার মতো মানুষের পক্ষে আপনার ঠাকুমার চাইতে আপনার মতো মানুষই বেশী বিপজ্জনক। কারণ আপনিই বলেছেন ওঁর মনটা অত্যন্ত কোমল, সুন্দর, অনুভূতিপ্রবণ। অথচ সামান্য একটু খেয়ে এসে তাঁকে কৃতার্থ ক'রে আসবেন তাতেও আপনার এত আপত্তি!'

শান্ত, সহজভাবেই ভূমিত্রী কথাগুলো বললো। ফলে প্রভাতের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হ'লো মারাত্মক। ভূমিত্রী যে তাকে এরকম কিছুই বলতে পারে সে-আশঙ্কা তার আগেও ছিলো। এবং হয়তো-বা সেই আশঙ্কাই তাকে আজকে এখানে টেনে এনেছে। সঙ্গে-সঙ্গে এ-আশাও কি সে করেনি যে, শেষ পর্যন্ত, সমস্তটা শুনে, আর পাঁচটা মানুষের মতো যুক্তিতর্কহীন সাধারণ ভাবাবেগের বশে বিষয়টাকে না দেখে, ভূমিত্রী এই নিয়ে তার সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্যও করতে পারে? কিন্তু সে-আশা বৃথাই হ'লো। ভূমিত্রী যা বললো সেই কথাগুলো তো

আর ফিরবে না! কথাগুলো এখনো তার কানে বাজছে। বাজতে থাকবে! আর এইই যদি তার সম্পর্কে ভূমিত্রীর মনোভাব হয়—প্রভাত আর পারলো না নিজের চিন্তার জালে নিজেই জড়িয়ে যেতে, বললো দাঁড়িয়ে প'ড়ে, 'চলুন উঠি আজ, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

ভূমিত্রী আপত্তি করলো না। যেতে যেতে বললো, 'খুব চ'টে গেলেন তো?'

প্রভাত বললো, 'না।'

'না!'

'আপনি যা বললেন তা আমাকে ভেবে দেখতে হবে। চটব কি চটব না সেটা তারপর ঠিক করব।'

'ভেবে দেখতে হবে! ভাবতে-ভাবতেই আপনি সারা হয়ে যাবেন! কী ভাববেন তাও আবার ভেবে দেখতে হবে না? আবার তাও ভাববেন কিনা সেও তো ফের ভেবে-ভেবে-ভেবে-ভেবে—'

কথাটা শেষ না ক'রে ভূমিত্রী হেসে উঠলো।

প্রভাত কিন্তু হাসলো না।

'এবারে চটেছেন?'

প্রভাত চুপ।

আরো-হাসিতে ভূমিত্রী উচ্ছলিত হ'লো। প্রভাতের পিঠে একটা চিমটি কেটে বললো, 'আশ্চর্য মানুষ বাবা! এরকম আর দেখিনি!'

'এবার সত্যিসত্যিই চটলাম!'—প্রভাত বাঁকা গলায় বললো।

'চটেছেন? বাঁচালেন!'—ভূমিত্রীর গলায় অবিশ্যি সাদামাটা ঠাট্টারই স্বর, 'কিন্তু কেন বলুন তো?'

'কারণ সমালোচনার পথ ছেড়ে এখন আপনি আমাকে তোয়াজ করা শুরু করলেন ব'লে'—কথাটা বলতে গিয়েও প্রভাত চেপে গেলো, ভূমিত্রীর হাতটা টেনে নিয়ে ঘড়ি দেখলো, তারপর: 'ওরে বাবা সোয়া দশটা। পালাই আজ।'—বলেই সে পেছন ফিরে হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

ভূমিত্রী থমকে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত প্রভাতের পেছনে তাকিয়ে।

৪

বাড়ি ফিরে আসতেই ঠাকুমা সুনয়নী প্রভাতকে ছেঁকে ধরলেন—মাধবীলতাকে নিয়ে যাবার পরে থেকে যা-যা হয়েছে সব বলতে হবে। উত্তরে প্রভাত সংক্ষেপে বললো, 'দিয়েই চ'লে এসেছি। আর কিছু গোলমাল হয়নি।' সুনয়নী এত অল্পে তুষ্ট নন, একটার পর একটা প্রশ্ন ক'রে যেতে লাগলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে নিজেই তিনি সম্ভাব্য উত্তরগুলিও দিয়ে-দিয়ে প্রভাতের কাছ থেকে শুধু হাঁ-না প্রত্যাশা করতে লাগলেন, কিন্তু গম্ভীর উত্যক্ত প্রভাত বিরক্তি ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করলো না। ফুলকাকীমাকে তাদের বাড়িতে স্থান দেবার জন্যে তাঁর মা ঠাকুমাকে বলবার জন্যে যে মিনতি জানিয়েছেন সেটাও সে বলতে গিয়েও চেপে গেলো।

মা হিরণ্ময়ী ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'চিঠি আছে তোর। দুটো বোধ হয়। ও-ঘরে তোর শেলফে আছে।'

খাওয়া হলো। রাত এখন অনেক, সাড়ে এগারোটা বাজে। ঘর এদের দুটো, রান্নাঘর বলতে কিছু নেই। রাত্রে ঢালাও বিছানা পড়ে মেঝেয়, বিছানা পাতা হবার পরে কোন ঘরেই আর পা ফেলবার জায়গা থাকে না বিশেষ। প্রভাত চিঠিদুটো নিয়ে নিজের বিছানায় আশ্রয় নিলো। একটি ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্র, এক সাহিত্য সংস্থার মাসিক বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে। অন্যটি? খামের চিঠি। নাম-ঠিকানা ইংরেজীতে লেখা! মেয়েলী অক্ষর। কে হতে পারে? নভসি? নভসি তার কাছে চিঠি লিখবে? চিঠিখানা হাতে নিয়ে প্রভাত নিজেই অবাক হয়ে গেলো নিজের হৃৎপিণ্ডের অবস্থা দেখে।

খাম খুলতে নীলাভ কাগজ বেরুলো। ইতি নভসি। প্রভাতের হৃৎপিণ্ডটি এবার একটি চূড়ান্ত লাফ দিয়ে ভূমিসাৎ হ'লো। ভীতিপ্রদেষু! বলে কী! এক দুই তিন চার পাঁচ সাড়ে-পাঁচ—মাত্র সাড়ে পাঁচ লাইন? 'আপনি কাজের লোক। অকারণে আসতে বলি সাধ্য কি! তা নিবেদন এই যে রবীন্দ্রজয়ন্তীর জন্যে এ-বছরও আমরা তিন দিনের একটি প্রোগ্রাম নিচ্ছি। তার একদিন তাসের দেশ করার প্রস্তাব আছে। গানগুলি আপনিই শিখিয়েছিলেন ব'লেই হয়তো সকলের ইচ্ছে গানে আপনিও অংশ নেন। সম্ভব হবে কি?

আমি অবিশ্যি বলে দিয়েছি দুরাশা। অসম্ভব হলে পত্রপাঠ জানালে বাধীত হই। সম্ভব হ'লে পত্রপাঠ এলে সবাই কৃতার্থ্য হবে!'

চিঠিখানা প্রভাত বহুবার পড়লো। প্রত্যেকটি শব্দের, প্রতিটি অক্ষরের চেহারা দেখলো, সম্মিলিতভাবে, আলাদা আলাদা ক'রে। চিঠির ভাব, ভাষাপ্রয়োগ, অন্তর্লীন শৈলী বিচার করলো। বাংলায় উচ্চ অনার্স-সহ বি, এ, পাস-করা প্রভাতের বানান-বিশেষজ্ঞ মগজ চিঠিখানায় দুটি, না আড়াইটি, বানানভুল বের করলো। প্রভাত মনে-মনে একটা ফুৎকার দিলো—বাংলায় এম, এ, পড়ছে যে মেয়ে সে 'বাধিত' 'কৃতার্থ' বানান ভুল করে! তাছাড়া 'সাধ্য কি!'-র কি-তে (প্রভাত ঈশ্বরকে জানালো যে) হ্রস্ব-ই-কার না দিয়ে দীর্ঘ-ঈ-কার জোড়া উচিত ছিলো; তাতে ক'রে ভাষাটা অনেক সম্ভ্রান্ত দেখাত, অর্থটা সাবলীলভাবে বেরিয়ে আসত। অবশ্যি ি-কার সত্ত্বেও, সৌভাগ্যক্রমে প্রভাতের হাতে পড়েছে ব'লেই, অর্থটা প্রাণে বেঁচে কোনক্রমে বেরিয়ে আসতে পেরেছে ঠিকই (কথাটা ভেবে প্রভাত ঈষৎ হাসলো)।

এরপর প্রভাতের চিন্তার দামোদর মুখ ঘুরিয়ে অন্য খাতে ধাবিত হ'লো। 'আপনি কাজের লোক,'—এর অর্থ কী? সাধারণ অর্থে এটা নিশ্চয়ই বলা হয়নি কারণ সেক্ষেত্রে কথাটার সঙ্গে আগেপিছে শ্রদ্ধা ওতপ্রোত হয়ে থাকত। নিতান্ত দৃষ্টিকটুভাবেই, তা নেই! রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কথাটাকে বিশ্লেষণ করলে, এর সঙ্গে যে মারাত্মক ভেজাল মেশানো হয়েছে তা বিশ্রীভাবে ধরা পড়ে যাবে—এতে সন্দেহের অবকাশ আছে কি। কিন্তু কেন এই ভেজাল। এর উৎস কী। অনুরাগ? ঈশ্বরেচ্ছায়, হয়তো তাই। হয়তো?

আলোটা জ্বালাই রয়েছে খেয়াল হ'লো। পাশের বিছানাগুলোতে ছোট ভাইবোনেরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু প্রতনু মনে হচ্ছে ঘুমোয়নি। আলোটা নেবানোই শ্রেয়। উঠে গিয়ে প্রভাত পাশের ঘর থেকে জল খেয়ে এলো, লক্ষ্য করলো মা তখনও হিসেবের খাতায় হিসেব লিখছেন ভেবে-ভেবে, ফিরে এসে সে সুইচ অফ ক'রে শুয়ে পড়লো।

'আমি অবিশ্যি ব'লে দিয়েছি দুরাশা।' দুরাশা! শব্দটি বেশ শ্লাঘ্য। মোহ আনে। কিন্তু সে-মোহ জখম হয়ে যাবে যদি কালকেই আমাকে নভসিদের বাড়ির দেউড়িতে গিয়ে কলিং বেল টিপতে দেখা যায়। সেটা এমন কিছুই অসম্ভব নয়। এবং সেক্ষেত্রে সবাই কৃতার্থ হবে নভসি জানাচ্ছে, তা হোক কিন্তু নভসি নিজে হবে কি, কৃতার্থ? এ-শব্দটার মধ্যেও বেশ ভেজাল! আমি

গেলে কি না-গেলে ওদের তাসের দেশ কিছুই আটকে থাকবে না। সুতরাং কৃতার্থ কথাটা বেহদ্দ ঠাট্টা। (হঠাৎ প্রভাতের খটকা লাগলো, আচ্ছা নভসি যে বেছে বেছে ঐ কৃতার্থ আর বাধিত শব্দেই বানানভুল করেছে সেটা ইচ্ছাকৃত নয় তো? অর্থাৎ কিনা বানানে ভুল রেখে এই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রাখা যে এদের অর্থ সরলভাবে বিশ্বাস কোরো না? তাই কি?)

না, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। চিঠিটা আর একবার দেখা দরকার। কিন্তু কেন এই উদ্বেগ? কী লাভ! এই দুর্বলতা আমাকে কোথায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, কোন্ গ্লানির অন্ধকারে? পরিণত, স্বচ্ছ, সজ্ঞান মনে বিচার করলে—আমি কি সত্যিসত্যিই নভসিকে জীবনের নিভৃততম সম্পর্কে পেতে চাই? ওর অসাধারণ দেহশ্রী, আমার চাইতে অনেক গুণ বেশী আর্থিক সচ্ছলতায় ওর অভ্যাস, নানান গুণে গরবিনী ওর কেন্দ্রাতিগ মেজাজ আমি আমার জীবনের নিভৃত, ব্যক্তিগত, একক সত্তার পরিসরে সহ্য করতে পারব কি। ওর সঙ্গে গত তিন বছরের পরিচয়ে সেরকম কোন আশ্বাস আমি পেয়েছি কি।

পরের দিন প্রভাত আপিস কামাই করলো।

বইয়ে মুখ গুঁজে সকাল-দুপুরের বেশির ভাগটাই সে প্রায় শুয়ে-শুয়েই কাটিয়ে দিলো। এক অক্ষরও পড়লো কিনা সন্দেহ। তাকে গ্রাস ক'রে রাখলো আত্মচিন্তার উগ্র ভীষণ অজগর তার প্রকাণ্ড হাঁ-য়ের মধ্যে। নিজের বিরুদ্ধে সে একটার পর একটা নালিশ আনলো, প্রতিটি নালিশের বিচারও সে করলো প্রাণান্তকর সওয়াল-জবাবে। বাদী দাঁড় করালো মাধবীলতাকে, ভূমিত্রীকে, নভসিকে এবং আরো অনেককেই! নানারকম ধারায় বিচিত্র সব মামলা দায়ের হয়ে গেলো!

সন্ধ্যায় দেশবন্ধু পার্কের পশ্চিমে আকাশ যখন রঙে রঙিন হ'লো তখন সে সেইখেনে সুরম্য একটি বাড়ির ফটকে এসে পৌছলো। কলিং বেল টিপবার দরকার হ'লো না, বারান্দায় বেতের চেয়ারে তিন-চারটি কিশোর-কিশোরী বসেছিলো, তাদের মধ্যে একজন রোদসী, নভসির ছোট।

প্রভাতকে দেখে রোদসী হাসিমুখে চেয়ায় ছেড়ে উঠলো, অভ্যর্থনা করলো প্রভাতের একটি হাত ধ'রে ওপরে উঠিয়ে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে। হাত ছেড়ে দিয়ে নিজেও সে একটি চেয়ারে বসলো, তারপর বললো, 'দিদি আপনাকে বসতে ব'লে গেছে। এক্ষুনি এসে যাবে। কাছেই একটা বাড়িতে গেছে।'

'কী ক'রে তোমার দিদি জানতে পারলো আমি আসব আজ ?'—প্রভাত চোখ বড়ো ক'রে অবাক ভঙ্গীতে বললো।

'তা তো দিদি আমাকে বলে যায়নি'—রোদসী বললো। শান্ত, বিলম্বিত লয়ে রোদসী কথা বলে, কিন্তু—প্রভাত মনে মনে মন্তব্য করলো, তেরো-চোদ্দ বছরের এই সালোয়ার আর ফ্রক-পরা মেয়েটির ভাব-ভাষা-ভঙ্গীর ব্যঞ্জনা ওর কুড়ি-একুশ বয়সের দিদি নভসির চাইতেও বেশী তাৎপর্যময় ব'লে মনে হয়!

প্রভাত হেসে বললো, 'তা বেশ। এখন আর বসব না আমি। দেখি যদি কাল আবার—'

'ওরে বাস রে'—রোদসী চোখে আতঙ্ক ফুটিয়ে বললো, 'আপনাকে ছেড়ে দিলে দিদি এসে আমাকে কেটে দু-টুকরো ক'রে ফেলবে। লক্ষ্মী হয়ে ব'সে থাকুন তো চুপটি ক'রে। মিলি ভাই, তুমি বিদেয় হও, এক ছুটে গিয়ে দিদিকে পাঠিয়ে দে শীগ্গি।'

'নভদি তো আমাদের বাড়িতে যায়নি'—মিলি ঘাড় দুলিয়ে বললো।

'যায়নি তো বেশ করেছে। তোমাদের বাড়ির পাশে আর একটি বাড়ি আছে, তাতে দোতলায় যে ফ্ল্যাট আছে সেখানে শোভনদা আছে সেখানেই না হয় নভদি গেছে। নেকু মেয়ে! যা পালা!'

'না ভাই, শোভনদাটা বড্ড পাজি হয়েছে আজকাল, আমাকে দেখলেই এমন করবে! এমন রাগ লাগে না আমার!'

'অহহহ!'—চোখমুখ উল্টে আর-একটি মেয়ে বললো, 'শোভনদার মতো ছেলে তোর দিকে ফিরেও তাকায় কিনা তার ঠিক নেই, গুল একটা মারলেই হ'লো!'

'না না না, সে হবে না'—রোদসী ত্রস্তে এসে পেঁচিয়ে ধরলো প্রভাতের কোমর (প্রভাত উঠে দাঁড়িয়েছিলো), 'বা-বা-বা, দিদি যদি থাকত তা'হলে তো বসতেনই। নেই ব'লেই আপনার এত তাড়া কেন। আরে ঐ তো দিদি এসে গেছে। জানো দিদি, প্রভাতদা পালাচ্ছিলেন। আমি কত করে বললাম—'

'আচ্ছা বেশ, পালাতে তো পারেননি। তোমার মতো ভোজপুরী দারোয়ান মোতায়েন থাকতে—'

'বা-বা-বা!'—রোদসী নাকে কেঁদে ওঠার অভিনয় করলো।

নভসি হেসে উঠে রোদসীর নাক নেড়ে দিলো, বললো অন্যান্যদের, 'তোরা চললি নাকি রে? ওলো শৈলী, তোর মেজদিকে বলিস তো প্রভাতদা এয়েছেন, তাসের দেশে তাঁকে পাওয়া যাবে। বলবি তো মনে ক'রে?'

'হ্যাঁ নভদি'—শৈলী বললো।

ওরা সবাই চ'লে গেলো। রোদসী প্রভাতের পিঠে গুম ক'রে এক কিল মেরে অন্দরে পালিয়ে গেলো।

বারান্দার বড়ো আলোটা নিবিয়ে ছোট্ট নীল আলো জ্বেলে দিয়ে নভসি বসলো। বললো, 'কী মশাই, বসতে আজ্ঞা হোক!'

প্রভাত ব'সে বললো, 'খুব ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে!'

ফিকে নীলাভ রেশমী আলো, বারান্দাটার দুপাশেই ছোট্ট জমিতে নানা-রকম ফুল গন্ধে মদির ক'রে তুলেছে বসন্ত বাতাস, কোথা থেকে সেতারে ইমনকল্যাণের আলাপ ভেসে আসচে। প্রভাতের ঘোর লাগলো। একটু পরে খেয়াল হলো নভসি তার কথার উত্তরে কিছু বলেনি। না বলুক, প্রভাত নভসির দিকে তখনো তাকালো না, পূর্বাকাশে বৃহস্পতি জ্বলজ্বল করছে তার দিকেই সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলো। এই বৃহস্পতিকে একদা তাকে ফুলকাকীমা চিনিয়ে দিয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদে থাকতে, সেই ছেলেবেলায়, কেন যেন তার হঠাৎ এইটে মনে পড়লো। আরো খানিক অপেক্ষার পরেও যখন নভসির কোন সাড়া পাওয়া গেলো না, প্রভাত ফিরলো তার দিকে। দেখলো বেতের চারপাইটার ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে অপলকে।

'কী ব্যাপার!'—প্রভাত বললো।

'ভাবছি'—নভসি বললো।

'কী!'

'কী-কী উপাদানে আপনি গঠিত, তাই।'

'তা না ভেবে'—প্রভাত একটু থেমে বললো, 'আত্মচিন্তা করলে বেশী উপকার পাবে।'

'আত্মচিন্তা? কী ক'রে হবে? একদিন তো শুনিয়ে দিলেন এক জাতের জীব আছে যাদের ঈশ্বর চিন্তা করতে শেখান না।'

'কথাটা মনে রাখার কী দরকার ছিলো।'

'আপনার কথা আবার কষ্ট ক'রে মনে রাখতে হয় নাকি। তবে দামী কথা চেষ্টা করলে আমিও এক-আধটা বলতে পারি, বলব দেখবেন? ঈশ্বর এক শ্রেণীর উচ্চস্তরের মানুষ সৃষ্টি করেন যাদের ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া আর-কিছুই করতে শেখান না।'

সেই পুরনো নালিশ! প্রভাত চিন্তা-চিন্তা-চিন্তার বিরুদ্ধে এই নালিশ

বহুবার শুনেছে, বহুজনের কাছ থেকে, বহুভাবে। গতকাল রাত্রে ভূমিত্রীও করেছিলো প্রভাতের মনে পড়লো। ব্যাধি এটা? কোন কিছু দেখে আমার যদি ভাবতে ইচ্ছে হয়, বিচার করতে ইচ্ছে হয়, ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের তফাত করতে ইচ্ছে হয়, ভালোকে মাথায় তুলতে আর মন্দকে ধূলিসাৎ করতে ইচ্ছে জাগে—সেটা ব্যাধি? ফুলে-ফুলে ভরা রক্তকরবী গাছটার দিকে তাকিয়ে প্রভাত ভাবতে লাগলো।

'আপনি যেন কী! ভীষণ ঝগড়াটে লোক! নয়তো আপনাকে দেখলেই আমার গলা চুলকোয় কেন ঝগড়া করবার জন্যে!'

আবহাওয়াটা বিশেষ ভারী হয়ে গিয়েছিলো মনে হওয়ায় সেইটে হালকা করবার চেষ্টায় নভসি আর কিছু বলবার না পেয়ে, চারপাইটায় একটা ঠেলা মারলো।

'চিন্তা করতে না শিখেও'—প্রভাত গম্ভীরভাবেই বললো, 'মূল্যবান কথাই বলেছো। আমি সত্যিই সব দিক থেকেই অকর্মণ্য।'

নভসি থমকে গেলো। বললো অধীর গলায়, 'ঐ! কথাটা বুঝি ঢুকেছে কানের মধ্যে! এমন মানুষ, বাবা-বাবা! অকর্মণ্য তো আপনি হাজার বার, লক্ষ বার, আবার বড়ো-গলা করা হচ্ছে! যাক আর ঝগড়া নয়। কাজের কথা মেলা আছে। কখন ফের ব'লে বসবেন, আমার সময় নেই চললুম—বলা তো যায় না!'

'সময় নেই কথাটা ঠিকই। তাছাড়া, তোমার চিঠি অনুযায়ী কাজ করতে হ'লে অবিশ্যি আমার আসা উচিত হয়নি আজ, তোমাকে চিঠিতেই বাধ্‌ইত করা উচিত ছিলো।'

'বা!'

প্রভাত হাসলো।

'হাসছেন কী! দেখলে গা জ্বলে। না, ওসব চলবে না, আপনার কোন ওজর আপত্তি শুনব না। সবাইকে ব'লে দেওয়া হয়ে গেছে আপনাকে পাওয়া যাবে আমাদের মধ্যে।'

'সে আর এমন কী, নাকচ ক'রে দিলেই মিটে যাবে।'

'না সে হবে না। কেন আপনার আপত্তি কীসের। কী, অন্য কোথাও এনগেজ্‌ড্‌ হয়ে গেছেন? না, তাই-বা কেমন ক'রে হবে, আমাদের ফাংশন কবে সে তো আপনি জানেনই না। না কি জানেন?'

'না, সেটা জানানোর দরকার মনে করোনি।'

'বেশ করেছি। সাতাশে বৈশাখ তাসের দেশ। দিন আপনার ডায়েরিটা, আমি নিজে-হাতে লিখে দিই। দিন না?'

'আসতে আমার আপত্তি নেই, তবে গাইতে নয়, শুনতে এবং দেখতে।'

'কেন?'

'কেন সে ব'লে এখন লাভ নেই। তুমি রেগে গেছ। ক্রুদ্ধ অবস্থায় আমার কথা তুমি বুঝতে বা মেনে নিতে পারবে না।'

'মানতে নাই-বা পারি, শুনতে বাধা কী।'

'না, এখন বলব না। অনর্থক পেড়াপীড়ি কোরো না।'

'বয়ে গেছে আমার'—ব'লে নভসি উঠে পড়লো।

'বয়ে গেছে আমার'—বারান্দার এককোণে দাঁড়ে-বসানো হরবোলা-টা নভসিকে ভেঙিয়ে উঠলো।

প্রভাত হা-হা ক'রে হেসে উঠলো। নভসি পাখিটাকে একটা কিল দেখালো। 'ব'য়ে গেছে আমার'—হরবোলা আবার ভেঙালো।

চিন্তিত, হতাশভাবে নভসি চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললো, 'কেন আপনি আমার সঙ্গে এরকম করেন বলুন তো।'

'অবাক হবার মতো কিছু করিনি।'

'কী অন্যায় করেছি পষ্ট ক'রেই বলুন না।'

প্রভাত উঠে প'ড়ে বললো, 'নাঃ বড্ড সীরিয়স হয়ে পড়েছো তুমি, আজকে আর কোন কথা জমবে না।'

নভসি উঠলো না।

'একটু এগিয়ে দিলে বাধ্ঈত হতাম!'

'কফি খাওয়াব, বসুন। আপনাকে গাইতে হবে না, বসুন।'

'নাঃ এখন আর ইচ্ছে করছে না।'

'পুরো একটি মাস বাদে এলেন, দু'মিনিট ব'সেই বিরক্ত!'—কথাটা বলতে গিয়ে নভসি শেষ পর্যন্ত তা বললো না, বললো, 'ঠিক আছে!'

'একটু যাবে না সঙ্গে?'—প্রভাত গম্ভীর মুখে বললো।

নভসি একটু ইতস্তত করলো, তারপর উঠে এলো।

পাশাপাশি চলতে লাগলো দুজনে, নীরবে। পাশেই প্রকাণ্ড দেশবন্ধু পার্ক।

আজ তিন বছরের ওপর ওর সঙ্গে আমার পরিচয়, কিন্তু কোনদিনই ও আমাকে নিয়ে এই পার্কে বসতে চায়নি, একসঙ্গে সিনেমার কথা তোলেনি,

বেলুড় কিংবা বোটানিক্‌স্ কিংবা ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করেনি—প্রভাত চিন্তা করতে লাগলো—আচ্ছা আমি যদি কোন মহৎ উপন্যাসের নায়ক হতাম আর নভসি হত নায়িকা, তা'হলে কি ওর মন ওর অন্তর্লোকের প্রকৃত পরিচয় পাবার জন্যে ওর সম্বন্ধে এখন যে-সব তুচ্ছ হাবি-জাবি কথা ভাবছি সে-সব ভাবতে পারতাম! নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কী সেই সব দুর্লভ, মহৎ ভাবনা? কেন সে-সব আমার মনে আসে না? না কি আসে, আমি হয়তো বুঝতেই পারি না?

'কথা বলছো না কেন?'—প্রভাতই শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙলো।

নভসি তবুও কিছু বললো না। প্রভাতের দিকে তাকালো না পর্যন্ত। থমথম করছে তার মুখ।

'গান আমি ছেড়ে দেব ভাবছি। আর ভাল লাগে না!'—প্রভাত বললো।

নভসি অবাক চোখে তাকালো।

'কোন-কিছুতেই আমার বেশী দিন মন বসে না। কেমন একঘেয়ে অর্থহীন মনে হয়। বিরক্তিকর লাগে।'

নভসির মতামত না নিয়েই প্রভাত পার্কের ভিতর ঢুকে পড়লো। মানুষ-জন যেখানে একটু কম সেইখেনে ফাঁকায় মাঠের মধ্যে প্রভাত ব'সে পড়লো। নভসি নীরবে তাকে অনুসরণ করলো, একটু ব্যবধান রেখে সে প্রভাতের মুখোমুখী বসলো।

সময় গড়াতে লাগলো নীরবে। দূরের আলোগুলি স্থির অনড় হয়ে রইলো। পাতলা অন্ধকারের পর্দা দুলতে লাগলো চঞ্চল হাওয়ায়।

আকাশের তারাগুলির দিকে তাকিয়ে প্রভাত ভাবতে লাগলো, অর্থহীনতায় দূরত্বে অনির্দেশ্যতায় লোভনীয়তায় ধরাছোঁয়ার বাইরে আকাশের ঐ যে-কোন তারার সঙ্গে হাতের নাগালের মধ্যে মুখ নিচু ক'রে ব'সে-থাকা এই মেয়েটার কোন্ পার্থক্যটা আছে!

'আচ্ছা তুমি যে এমনি অবাধে আমার সঙ্গে মেশামেশি করো তাতে তোমার গুরুজনেরা বা আত্মীয়স্বজন বা অন্য-কেউ কখনো আপত্তি করে না?' —এই কথাটি প্রভাত মনের মধ্যে তৈরী করলো, ভাবতে লাগলো এই কথাটি সব চাইতে ভালভাবে, শালীনতা বজায় রেখে, সাদামাটাভাবে কীভাবে বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও প্রভাত কথাটার স্থূলত্ব কাটিয়ে উঠতে পারলো না।

'এক ধরণের মানুষ থাকে শুনেছি অন্যকে পীড়ন ক'রেই যাদের আনন্দ! আপনি অবিশ্যি আরো এক কাঠি বাড়া, আপনার আনন্দ নিজেকেও পীড়ন ক'রে!'—অবশেষে নভসি মৃদু কিন্তু উষ্ণ গলায় কথাটা বললো।

কথাটা শুনে প্রভাত মনের মধ্যে চমকে উঠলো। ভূমিত্রীও গতকাল রাত্রে এমনি এক পার্কের অন্ধকারে তার বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ করেছিলো। অথচ তার ফুলকাকুর বিরুদ্ধে তার অভিযোগও তো একই। তবে কি শেষ পর্যন্ত এইটেই প্রতিপন্ন হবে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ফুলকাকুর সঙ্গে তার কোনই প্রভেদ নেই!

'সাহিত্য ছেড়েছেন'—নভসি কঠিন গলায় বলতে লাগলো, 'এখন বলছেন গানও ছাড়বেন! কেন? না একঘেয়ে লাগে। কিন্তু এতই যদি বৈচিত্র্যের নেশা তা'হলে চাকরি যেটা করছেন বছর ন'দশেক ধ'রে, সেটা তো ছাড়েন না? সেটা একঘেয়ে লাগে না!'

আমি জানি যে-চাকরি আমি করি সেটা তোমার মনঃপূত নয়!'—প্রভাত রহস্যজনক সুর ফোটালো কথাটায়।

নভসি ঘাড় বেঁকিয়ে বললো, 'নয় তো নয়—তাতে আপনার কী এসে যায়। কী বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কী চাকরি করেন না-করেন তা নিয়ে আমার কোনই মাথাব্যথা নেই এই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। কী প্যাঁচের লোক বাবা! আপনি মানুষকে পাগল ক'রে ছাড়তে পারেন দেখছি।'

'পাগল ক'রে ছাড়তে পারি?'—প্রভাত চিন্তিত গলায় বললো, 'বলো া! কালকে এই নালিশ কিন্তু আরো একজন করেছিলো।'

'কে?'

'ভূমিত্রী।'

'তাকেও আপনি পাগল করছেন নাকি!'

'তার মানে?'

'মানে তো আপনি বলবেন।'

'চলো ওঠা যাক, তুমি ঝগড়া শুরু ক'রে দিয়েছো'—ব'লেই প্রভাত উঠে পড়লো।

নভসি উঠলো না। শক্ত হয়ে ব'সে থেকেই বললো, 'আপান যেতে পারেন। আমি পরে যাব।'

'একা-একা ভয় করবে না?'

'না, আমার অভ্যেস আছে।'

প্রভাত বেমক্কা শব্দ ক'রে হেসে উঠলো। ব'সে পড়লো আবার।

'বোকার মত হেসে উঠলেন কেন?' নভসি প্রশ্ন করলো।

'তোমার বুদ্ধির কাছে আমি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছি ব'লে।'

'তাহ'লে আরও দুবার হাসুন।'

বিশ্রী শব্দ ক'রে প্রভাত আর একবার হেসে উঠে বললো, 'আর এক-বারেরটা তোলা থাক, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে একা-একা হাসা যাবে। চীনেবাদাম খাবে?'

'না ধন্যবাদ।'

'রেগে গেলে তোমার চোখদুটো অন্ধকারেও কী চমৎকার জ্বলে। বেড়ালের মতো।'

'আর কারো জ্বলে না এরকম?'

প্রভাত চুপ।

'ভূমিত্রীর? জ্বলে না ভূমিত্রীর চোখ অন্ধকারে? বেড়ালের মতো?'

প্রভাতের চোখ দুটো নিস্পলক বিস্ফারিত হয়ে রইলো নভসির দিকে।

'ওকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে। একদিন আলাপ করিয়ে দেবেন।'

'কেন?'

'কে জানে। আচ্ছা, ওকে ওর বর ফিরিয়ে নেবে না?'

'তাড়িয়ে তো দেয়নি কাজেই ফিরিয়ে নেবার প্রশ্ন ওঠে না।'

'তা না উঠুক, কিন্তু বরকে ছেড়ে ও সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে! কী রে মেয়েটা!'

'তুমি এমনভাবে বলছো যেন ভূমিত্রী তোমার সমবয়সী।'

'মোটেই না। আমার সমবয়সী হওয়া দূরে থাক, আমার তো মনে হয় আপনার চে'ও বড়ো হবে বয়সে।'

'কেন?'

'কেন আবার কী। হতে পারে না বড়ো?'

'না। আমার বয়স এখন আটাশ আর ভূমিত্রীর ছাব্বিশ।'

'বাবা! ঠিকুজি-কুষ্ঠিও দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে!'

'আমি তো তোমার বয়সও জানি।'

'কত?'

'কত আর! এই বড়ো জোর কুড়ি হবে।'

নভসি চুপ।

'তুমি অবিশ্যি জানতে না আমার বয়স।'

'বয়স জানলেই স-ব হয়ে গেলো ?'

'তোমার মতে।'

'কী যে হেঁয়ালি করছেন কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে'—উত্যক্ত অস্থির দেখালো নভসিকে।

প্রভাত হেসে উঠলো।

'তিনবার কিন্তু হয়ে গেলো!'

'ভূমিত্রী কিন্তু'—একটু পরে প্রভাত বললো, 'কোনদিন তোমাকে দেখতে কিম্বা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়নি।'

'আমার সম্বন্ধে কী-বা সে জানে!'

'তুমি তার সম্বন্ধে কী জানো ?'

'জানি যে ভূমিত্রীর মতো মেয়ে হয় না। কোটিতে গুটিক! লাখে না মিলয়ে এক! তবে কিনা তিনি সাহিত্যও পছন্দ করেন না গানও পছন্দ করেন না! কিন্তু তেল-কোম্পানীর আপিসে ব'সে-ব'সে কেরানিগিরি বড্ড পছন্দ করেন! নিন যাবেন তো চলুন, আমার আর সময় নেই'—ব'লেই নভসি উঠে পড়লো। হাত উল্টে ঘড়ি দেখে আঁতকে উঠে বললো, 'ঈস নটা বেজে গেছে। মার কাছে বকুনি খেতে হবে—কী হবে ?'

প্রভাত উঠে দাঁড়ালো, হাত পা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে গায়ের জড়তা ভাঙলো, তারপর বললো, 'অন্ধকারে তোমার ঘড়ির কাঁটাও জ্বলে দেখছি। তোমার চোখের মতো।'

'তখন থেকে কী যে বলছেন আবোলতাবোল!'—ব'লে নভসি প্রভাতের অপেক্ষা না রেখে তড়বড়িয়ে চলতে শুরু করলো দ্রুত।

প্রভাত পেছন থেকে গলা তুলে বললো, 'আমি তাহ'লে চলি, কেমন ?'

নভসি ঘাড় ফেরালো না। হাঁটার দারুণ বেগটাও কমালো না। পার্কের বাইরে বেরিয়ে একটু সে নরম হলো, তখনো অবিশ্যি পেছন ফিরে দেখলো না প্রভাত আসছে কি আসছে না। কিন্তু বেশ খানিকটা এগোনোর পরেও যখন প্রভাতের সাড়াশব্দ কিছুই পাওয়া গেলো না, অসহ্য রাগে সে অন্ধ হয়ে গেলো, চোখের সামনে রাস্তাটা সব যেন কোথায় অদৃশ্য লুপ্ত হয়ে গেলো নিমেষে, রাগের চরম তীব্রতায় মুখের লাল সাদা হয়ে গেলো—তখন সে থমকালো, একটু পরে ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু কই সে ? অন্য দিক দিয়ে চলে গেছে ? কী বোম্বেটে মানুষ বাবা! এত দেমাক! এত অগ্রাহ্য! সত্যিই

চলে গেছে? তাই কি হতে পারে? না তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই দুষ্টুমি ক'রে কোথাও লুকিয়ে আছে। ফস্ ক'রে কোথা থেকে বেরিয়ে পড়বে। ওর এরকম লুকনো বাতিক আছে আমি জানি। আরো দুদিন এমনি ধাঁধায় ফেলেছিলো এমনি পাজি! কিন্তু আজকে আমি তোমার গুমোর ভাঙব। কথাই বলব না আর। কথা বলা দূরের কথা, চিনতেই পারি কিনা সন্দেহ।

কিন্তু রাস্তা যে ফুরিয়ে এলো। কোথায় সে? দম ফেটে নভসির কান্না পেলো তখন। রাগ ক'রেই চ'লে গেলো না তো মানুষটা? অনেক কটু কথা ব'লে ফেলেছি, তাই হয়তো। কিন্তু সে-জন্যে দোষ কার? গান ছেড়ে দেব, কথায় কথায় ভূমিত্রী, আকাশের দিকে তাকিয়ে বোবা নির্বিকার হয়ে থাকা— এ-সবের মানে কী! এতে মানুষের পিত্তি জ্ব'লে যায় না?

বাড়িতে ঢুকে মা'র চোখ এড়িয়ে চুপিসারে দোতলায় নিজের ছোট্ট ঘরটায় গিয়ে সরাসরি সে টেবল-ল্যাম্প জ্বেলে চিঠির প্যাড টেনে নিলো। উত্তেজনায় জ্বলছে তার সারা দেহ, মন। এত দেমাক তোমার! এত দেমাক! কী লেখা যায় চিঠির পাঠ? লিখলো: 'ভীতিপ্রদেষু'। না: এটা একবার হয়ে গেছে। কাটলো সে লেখাটা। কাটাকুটিটা ক্রমে একটা ছবি হয়ে উঠলো। কীসের ছবি সেটা নিজেই বুঝে উঠতে পারলো না। উ: বড্ড গরম। বাবাকে ব'লে একটা পাখা করিয়ে নিতে হবে, টেবলফ্যানটা ছোড়দা নিয়ে ভেগেছে সেটা আর ফিরে পাওয়া দুরাশা। কাগজটা সে কুটিকুটি ক'রে জানালা দিয়ে বাইরে শূন্যে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলো। একটা মনের মতো পাঠ মনে আসচে না কেন? আচ্ছা, কিছু না লিখলে কেমন হয়? অনেকেই তাই করে, আমি জানি। না, সেটা বড্ড বাড়াবাড়ি দেখাবে। ভাববে আমার সব ফুরিয়ে গেছে তার কাছে। অতটা ভাবতে দেয়া ঠিক না। নিজের কিছু মূল্য নিজের হাতেই রাখা ভালো। তাহ'লে কী লিখি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এইটেই ঠিক হবে—অবশেষে নভসি ঝুঁকে প'ড়ে প্রথমেই চিঠিতে তারিখ দিলো সময় লিখলো, তারপর লিখলো:

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর সবিনয়নিবেদনমিদম্

মমানুগ্রহকারক

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রেভাত কুমড়ো বসু বাহাদুর

অনুগ্রহকারকেষু—

সমাচার এই যে,

এই পর্যন্ত লিখতে-লিখতেই নভসির কী যে হাসি পেলো আর মনের মধ্যে এমন কিছু হতে লাগলো যে টুলে ব'সে থাকা অতঃপর তার পক্ষে অসম্ভব হ'লো, মনের মধ্যে হাসির প্রবল ঢেউগুলিকে সামলাতে সামলাতে সে লেখা-কাগজটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে এলিয়ে পড়লো বিছানায়, চিৎ হয়ে শুয়ে সে লেখাটা চোখের সামনে মেলে ধরলো আর অমনি কোথা থেকে দূরাগত ঢেউয়ের পর ঢেউ নানান রঙে নৃত্যপরা হয়ে তার মনের উপকূলে ছুটে এসে-এসে অবার পালিয়ে যেতে লাগলো, তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে জ্বলে উঠেই মিলিয়ে যেতে থাকলো সবুজ স্বপ্ন, আচ্ছন্ন চেতনায় কাগজটা তার মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে গেলো।

নভসি ঘুমিয়ে পড়লো।

৫

কোন সকাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে তার ঠিক নেই। না, বিন্দে ঝি ভোরের প্রথম চা দিতে এসে ব'লে গেলো, বিষ্টি নেমেছে সেই শেষ রাত থেকে। কী কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। বিন্দেকে জানালাটা বন্ধ ক'রে দিতে বলব ভাবলাম, বলা হ'লো না। কিন্তু ওঠা অসম্ভব। হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে জড়ো ক'রে দ-হয়ে শুলো নভসি। আচ্ছা, এখন বৃষ্টি? এ না চৈত্রমাস? চৈত্রের শেষ তো। এখন তো কালবোশেখীর সময়, সন্ধের দিকে। অথচ দ্যাখো আকাশের কী পাগলামী। সবই যেন কেমন সৃষ্টিছাড়া হয়ে গেলো পৃথিবীর। ঐ মানুষটার মতো। কোন-কিছুর অর্থ নেই, মাথামুণ্ড নেই। চিলে কোঠা থেকে রোদসীর গলা-সাধার সঙ্গে হারমোনিয়মের একঘেয়ে সুর ভেসে আসচে। সবাই বলে রোদসীর গলা আমার চেয়ে ভালো, অনেক বেশী সুরেলা, অনেক স্পষ্ট। সে তো ভগবানের হাত। আমি কী করতে পারি। তাই. ব'লে রোজ ভোর রাত্তিরে উঠে চেঁচানো? থাক বাবা। সুরেলা আর স্পষ্ট হয়ে আমার কাজ নেই। কী হবে! কদিনের জন্যে গান! সে তো কাল ব'লে গেলো ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু শোভন নিশ্চয় বলবে তোমার গান আমি আজীবন শুনতে চাই। শোভন বেশ ভালো। মিষ্টি স্বভাব। অর্থ বোঝা যায়। ভদ্র বুদ্ধিমান উজ্জ্বল ছেলে। কী সুন্দর আবৃত্তি করে। এত কবিতাও জানে। নতুনদের সব কবিতা এমনিতে পড়লে তো কিছুই বুঝতে পারি না, কিন্তু শোভন যখন বিভোর গলায় প'ড়ে শোনায়, আবৃত্তি করে, তখন তো মনে হয় না কিছু বোঝা গেলো না, বরং বেশ লাগে কিন্তু তখন মনের মধ্যে, বুকের মধ্যে কী যেন তোলপাড় করতে থাকে। শোভন খুব ভালো। শোভনকে আমি ভালোবাসি। কথাটা চেঁচিয়ে জানাতে ইচ্ছে করে ঐ লোকটাকে। ঐ বরফের তালের মতো, আজকের বিশ্রী সকালের মতো ঐ মানুষটাকে। দেখতাম তবু যদি মানুষটার আচরণের কোন হদিস পাওয়া যায়।

ইস, কেউ যদি এসে রেডিওটা খুলে দিয়ে যেত। আচ্ছা বিজ্ঞান এত করছে, এটা কবে করতে পারবে যে, ধরো কোনো একটা যন্ত্রের সাহায্যে

কিংবা ধরো এমনি-এমনিই, তোমার মনের মধ্যে কী আছে সেটি আমি স্পষ্ট বুঝে নিতে পারলাম। চাঁদে গিয়ে কী হবে। মঙ্গল গ্রহের রহস্যের নিকুচি ক'রে আমার কোন সুসারটা, তিন বচ্ছর ধ'রে রক্তমাংসের ঐ যে মানুষটাকে চোখের নাগালের মধ্যেই পাচ্ছি তার রহস্যেরই যখন কোনো কিনারাই করা গেলো না! লোকটা যেন শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার 'নিষ্কাম' শব্দটার থেকে বেরিয়ে এসেছে! যেন জগৎসংসারের সব কিছুই ঐ মহাপুরুষটি জেনে, বুঝে শোধ-বোধ ক'রে দিয়ে ব'সে আছে। আকাঙ্ক্ষাও নেই নিবৃত্তিও নেই কোনো কিছুতে। অথচ কী পাজি ওর চোখদুটো। যখন চোখ তুলে তাকায় খুব বোঝা যায় ঋষির চোখ না।

কে যেন ঘরে ঢুকেছে। গলাটা পরিচিত। 'ঘুমোচ্ছে না হাতী, মটকা মেরে প'ড়ে আছে'—রোদসী বলছে। বটে! দিন-দিন সাহস বাড়ছে মেয়েটার। একটু শাসন দরকার। দাঁড়া, দিদির নামে যা-তা বলা বের করছি আজ। 'এত বেলা অব্দি বিছানায়, কী বিলাসী মেয়ে রে বাবা!' কে? অলকাদি না? সর্দি হয়েছে বোধ হয়, তাই গলাটা একটু বেখাপ্পা লাগছে। অলকাদি হলে তো সেরেছে। নিশ্চয় ধার চাইতে এসেছে। কী বিশ্রী স্বভাব ভদ্রমহিলার। শোধ করবার নাম নেই কখনো, অথচ কেমন ভালোমানুষের মতো বলবে: গোটা কয়েক টাকা ধার দেবে নভসি, বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেছি। না, আজকে আমি মুখের ওপর না ব'লে দেব। মানুষ এত নির্লজ্জ যে কী ক'রে হতে পারে আশ্চর্য। না, অভদ্রের মতো ঠেলা দিচ্ছে। কী অসভ্যতা। রোদসী বোধ হয় চ'লে গেছে, ঘরে থাকলে যা কলকলানী ওর গলা পাওয়া যেত। কী আশ্চর্য, সুড়সুড়ি দিচ্ছে পায়ে! অগত্যা, হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে, নভসি চোখ কচলাতে লাগলো।

'এত বেলা অব্দি ঘুম? রাত্রে ঘুম হয় না বুঝি!'—অলকাতিলকা রায় হাসির ঢেউএর ওপর থেকে কথাটাকে গড়িয়ে দিলো।

তখন নভসি হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে আলস্য ভাঙছে। রাত্রে ঘুম হয় না প্রশ্নে তার বুকের মধ্যে দোলা লাগলো, কথাটা তো ঠিকই, শেষ রাত্রের দিকে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিলো নভসির মনে পড়লো, তারপর সে কী যন্ত্রণা, উদ্ভট সেই চিন্তার উথালপাতাল বিকট সেই কালো-কালো নিরবয়ব ছায়ামূর্তিগুলোর ভোজবাজি উৎকট সেই নিঃসাড় রাতের গর্তের অতলে সে কী নির্দয় কুম্ভীপাক—

'কী হ'লো নভসি ? শরীর খারাপ ? না মন ?'—অলকাতিলকার গলায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেলো।

'এক মিনিট বসুন অলকাদি, আমি একটু আসছি'—বিস্রস্ত শাড়ি সামলাতে সামলাতে নভসি, বিজড়িত কুণ্ঠায়, বাথরুমের উদ্দেশে চ'লে গেলো। তাড়াতাড়ি ক'রে মুখটা ধুয়ে ফেললো, কিন্তু বেশ সাবধানে, বাঁ-হাতটায় জল না লাগে। অলকাদি যখন আজকেই এসে গেছে, ঠিক আজ সকালেই, এই বৃষ্টির মধ্যেও, অবধারিত দৈবপ্রেরিত, কাজেই হাতটা দেখিয়ে নিতে হবে আজ। দু-তিন মাস অলকাদি হাত দেখেনি। ভবিষ্যতের কোন হদিস দেখা যাক যদি দিয়ে দিতে পারে অলকাদি। এর আগে তো পেরেছে। অনেক কিছুই বলেছে যা হুবহু মিলে গেছে। শাস্ত্রটা তো আর মিথ্যে নয়। শুধু তা শিখতে পারা চাই। গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু অলকাদি, আশ্চর্য, কী ক'রে এত সব শিখলো ? অবিশ্যি সে গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু জ্যোতিষে সত্যিকারের জ্ঞান কি তার আছে ? ব'লে তো দেয় দেখি সবই, অধিকাংশই তো অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। ছুটে চ'লে এলো নভসি ঘরে, অলকাতিলকার সামনে এসে সরাসরি বাঁ হাতটা চিতিয়ে দিয়ে ভীরু লাজুক চোখে হাসলো।

ঠোঁট টিপে একটি চোখ খাটো করলো অলকাতিলকা রায় তার সুন্দর চশমার নিচে। 'চোখ বোজো তো নভসি'—সে বললো। 'ওমা কেন!' 'বোজোই না একটা মজা হবে।' মজা দেখতে নভসি চোখ বুজলো। অলকা তখন বটুয়া থেকে একটি দশ টাকার নোট বের ক'রে নভসির হাতে গুঁজে দিলো।

'এ কী ?'—নভসি অবাক।

'কী আবার। তোমার কাছে আমার এখনো অনেক দেনা আছে, মাত্র কানাকড়ি শোধ হ'লো।'

নভসি অপ্রস্তুতের একশেষ। ছিছি, অলকাদি কি আমার মনের কথাটা ধ'রে ফেলেছে ? ধার চাইলে আজ মুখের ওপর না ব'লে দেব ভাবছিলাম, সেইটে বুঝতে পেরেই কি সে আমাকে এমনি জব্দ ক'রে দিলে ? কী লজ্জা। 'আমার কিন্তু টাকার এখন একদম দরকার ছিলো না'—নভসি কুণ্ঠিত গলায় বললো, 'থাক না এখন।'

'না বাছা, দরকার নেই তো তুলে রেখে দাও, ফের এসে হাত পাতলে তখন দিতে পারবে। কী, হাত বাড়িয়েছিলে কেন, নতুন কিছু গজিয়েছে নাকি!'

'ধেৎ। দাঁড়ান একটু চা ব'লে দিয়ে আসি?'—ছুটে বেরিয়ে গেলো নভসি। তেতলার সিঁড়ি থেকেই সে একতলার উদ্দেশে চেঁচালো, 'পানু, এই পানু, পানু—!'

বারো বছরের চাকর পানুকে ছুটে আসতে দেখা গেলো সিঁড়িতে।

'এই শোন, মাকে বলগে যা বড়দির ঘরে কে একজন এয়েছে, চা আর যা-হোক-কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে। পারবি তো হাঁদারাম?'

'গণক দিদিমণি?'—পানু অরুচির সঙ্গে বললো।

'দেব কান ছিঁড়ে'—ব'লে নভসি তাড়া করতেই পানু ছুটে পালিয়ে গেলো।

ফিরে এসে নভসি ফের বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিলো অলকার সামনে। 'দেখুন তো অলকাদি, হাতে নতুন কিছু পান কিনা। আচ্ছা, আপনি তো ভীষণ, এই পচা দিনে অদ্দূর থেকে এত্ত সকালে টাকা দিতে এয়েছেন! কেন, আমার আয়ু কি ফুরিয়ে এয়েছে?'

'স্বার্থ ছাড়া অলকাদি এক পাও নড়ে না বাছা। ঠেকায় প'ড়ে এসেছি। বলছি। তা হাত তোমার ভাই ভালোই বলছে! উঁ! কী ব্যাপার! উঁ? কী সব দেখছি! এই প্রথম?'

নভসির হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগলো। বললো লাল হয়ে গিয়ে, 'ধেৎ। কী সব বলছেন।'

'ভালোই। নামটি কী ভাই?'

'আপনার শীত লাগছে না অলকাদি? উঃ কী ঠাণ্ডা হাওয়া। জানলাটা বন্ধ ক'রে দেব?'

মুচকি হেসে অলকা বললো, 'তোমার ইচ্ছে হলে দাও। আমার তো ভালোই লাগে, এমনি বাদলা দিন! মনে হয় যেন আজ কোন তাড়াহুড়ো নেই, চতুর্দিকে কেবল দাও-দাও নেই, কোন নালিশ নেই, সংসারের নাগপাশ বন্ধন থেকে এই একটু মুক্তি। তাছাড়া, তুমি জানলা বন্ধ করতে চাইছ কী রকম! তোমার এখন মনের যা অবস্থা, জানলা তো জানলা, দরজাটরজাও সব খুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হবার কথা। তাই না? বাসাটা কোথায় গো? অনেক দূরে? যত দূরে, প্রথম অভিসারের রোমাঞ্চ তো ততই বেশি হবার কথা বাছা! চলো না, আলাপ ক'রে আসি? দেখে আসি তোমার ভাগ্যটা!'

'সে তো আপনি হাতেই দেখতে পারেন?'

'পাগল! আমার যদি তত ক্ষমতাই থাকত তা'হলে আমি এতবার

ঠকলাম কেন। জ্যোতিষের আমি অনেক কিছুই আয়ত্ত করতে পেরেছি তা ঠিকই, কিন্তু এই একটা বিষয়ে পুরুষ জাত আমাকে একদম বোকা বানিয়ে দিয়েছে। এ-রহস্যের সমাধান জ্যোতিষ কেন, কোন শাস্ত্রেই আছে ব'লে আমার বিশ্বাস নয় ভাই। লোকে বলে, প্রাণের উৎপত্তির রহস্য বিজ্ঞান কোনদিন সমাধান করতে পারবে না, আমারও তেমনি মনে হয় প্রেমের উৎপত্তির রহস্যেরও কোন মীমাংসা তোমাদের কলাশাস্ত্র সত্যি সত্যি কোনদিনই করতে পারবে না।'

'আচ্ছা হাত দেখে ঠিক কী মনে হচ্ছে বলুন তো? ঠিক-ঠিক বলবেন কিন্তু অলকাদি।'

'এত ভয় পাচ্ছো কেন।'

'ভয়ের কিছু নেই?'

'নেই আবার! একশোবার আছে। কিন্তু ভয়টাই তো ভাই প্রেমের আনন্দ, ওটা কেটে গেলে আর রইলো কী।'

কথাটা শুনে নভসি কথাটার মধ্যে যেন ডুবে গেলো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত আনমনে সে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কানের পাশে চূর্ণকুন্তল বিন্যাস করলো। আপন মনেই অস্ফুটে বলতে লাগলো, 'তা হোক। কিন্তু আমি যে ঠিক বুঝতেই পারছিনে। একটা কিছু বোঝা তো চাই। জিনিসটা যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এরকম শূন্যে ঝুলে থাকা যায় কখনো? দু-তিন বছর ধ'রে দেখছি অথচ বুঝতেই পারিনে যে আমাদের মধ্যে, যাকে বলে অন্তরঙ্গতা, তা বাড়ছে না কমছে নাকি একই আছে না কী হচ্ছে কিচ্ছুই বুঝতে পারি না। কী অদ্ভুত। এমন বিশ্রী লাগে না আমার সময়-সময়। মনে হয় যেন কখনো-কখনো নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে—আমার কথা শুনে আপনি মনে-মনে হাসছেন তো? ভাবছেন তো খুব ছেলেমানুষ আমি, পাগলের মতো কথা বলছি? কিন্তু কী করব বলুন—।' বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠলো নভসি। আরক্ত চোখ মুখ কান তার যেন ফেটে পড়লো লজ্জায়।

অলকাকে কিন্তু হাসতে দেখা গেলো না। বরং তার মুখেচোখে একটু আগেও তরল কৌতুক প্রচ্ছন্ন ছিলো। কখন তা মিলিয়ে গেছে, সেখানে ফুটেছে কী এক গূঢ় কাঠিন্য। নীরস গলায় বললো, 'এত ভাববার কী আছে! আমি তো কখনো অতশত ভাবি না।'

একটু ইতস্তত ক'রে নভসি বললো, 'না ভাবুন, কিন্তু মনের মধ্যে অশান্তি হয় না কখনো?'

বিরক্তির সুস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠলো অলকার চোখেমুখে। 'তুমি ভাই একটু বোকার মতো কথাবার্তা বলছো'—সে বললো শুকনো হেসে, 'যাকে তোমার ভালো লেগেছে তাকে কি তুমি বিয়ে করতে চাও ?'

নভসি তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালাটা বন্ধ করলো। ঘরটা প্রায় অন্ধকারই হয়ে গেলো। আলোটা জ্বেলে দিয়ে নভসি ফিরে এলো চেয়ারে।

'বিয়েটা সম্ভব তো ?'—অলকা 'বিয়ে' শব্দটার ওপর কেমন একটা চাপ দিয়ে কথাটা বললো।

নভসি বুঝতে পারলো না অলকাদি ঠিক কী বোঝাতে চাইছে। চোখ তুলে সে চুপ করেই রইলো।

'লোকটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কি হবে না এই নিয়েই তোমার ভয় ? না কি তার সঙ্গে তোমার মনের বোঝাপড়া হবে কি হবে না তাই নিয়ে উদ্বেগ ?'

নভসি আগেও জানত, বিয়ে জিনিসটার ওপর অলকাদির আস্থা নেই। কিন্তু এখন যেমন অলকাদির এই কথাগুলো শুনতে তার রাগ ধ'রে যাচ্ছে আগে তো তা কখনো হয়নি। অলকাতিলকা রায়ের সঙ্গে তার পরিচয়ের সূত্রপাত এক গ্রামের মানুষ এই সুবাদে। মুখ চেনাচেনি ছিলো ছোটবেলা থেকেই। বছর দশেক আগে ক্লাস সিক্সে তখন সে পড়ে, অলকা ওর বাবার কাছে প্রায়ই আসত একটা কিছু চাকরির সংস্থানের জন্য। বয়স কম হলেও নভসি বুঝতে পারত, বাবা-মা বা বাড়ির অন্যান্য বড়োরা কেউই অলকাদিকে পছন্দ করত না, কেন সেটা যদিও সে স্পষ্ট বুঝতে পারত না, অথচ তার কিন্তু অলকাদি সম্পর্কে খুব একটা কৌতূহল সব সময় হত। বাবা অনেকটা বিরক্ত হয়েই শেষ পর্যন্ত অলকাদিকে তার প্রাইভেট টিউটর ক'রে দিলেন, তখন সে ক্লাস এইটের ছাত্রী। নভসি প্রথমটা অশ্রদ্ধার সঙ্গেই এটা মেনে নিয়েছিলো, অলকাদির প্রতি করুণাবশতই সে বাবার কাছে এর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়নি। কিন্তু তার মনে আছে, সেই অশ্রদ্ধা বেশীদিন থাকেনি। পড়ানোর সুন্দর ভঙ্গী, ছাত্রীর মনের কথা মনের ধরন মনের ক্ষমতা বুঝে নেবার সহজ ক্ষমতা, ছাত্রীর প্রতি দরদ আর আন্তরিকতা ইত্যাদির দ্বারা অলকাতিলকা রায় অচিরেই নভসির মন জয় ক'রে ফেলেছিলো। তার প্রবেশিকা পর্যন্ত তাই অলকা এই চাকরিতে বিনা বাধায় বহাল ছিলো। একথা নভসি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে যে, সে যে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা উৎরোতে পেরেছিলো তার পেছনে অলকাদি না থাকলে হ'ত না। এই কৃতজ্ঞতার ফলেই, বাড়ির প্রায়

সকলেরই অপছন্দের বিরুদ্ধেও সে অলকাদির এ বাড়িতে নিয়মিত আসা এবং তার প্রতি সামাজিক সৌজন্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কিন্তু মেয়েদের স্বাধীনতা, অতিরিক্ত কর্তৃত্বপ্রিয়তা, সব-কিছু নিয়ে অতিমাত্রায় খুঁতখুঁতি, সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই নিজস্ব মত—অলকাদির এই সব ব্যাপার নভসির চিরদিনই কেমন যেন অস্বস্তিকর লাগে। মনে-মনে সে তার সম্বন্ধে এই জন্যেই হয়তো-বা একটু বিতৃষ্ণা পোষণ করে। নভসির বিশ্বাস, এই জন্যেই অলকাদির এখনো বিয়ে হ'লো না। সে জানে অলকাদি বহুবার প্রেমে পড়েছে, অলকাদির মুখেই প্রত্যেকটি প্রেমের কাহিনী শুনে-শুনে তার এমনি একটা ধারণা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি পুরুষই শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় অলকাদির কাছ থেকে। অথচ অলকাদি দেখতে তো ভালোই, স্বাস্থ্যও বেশ, সরকারী আপিসে কেরানীর চাকরি করছে অর্থাৎ উপার্জনও আছে—এখনকার বিয়ের বাজারে বেশির ভাগ ছেলেরা আর কী চাইবে।

'তুমিও শেষ পর্যন্ত এত সাধারণ হয়ে যাবে'—অলকাতিলকার কঠিন যান্ত্রিক গলা আবার নির্দয় প্রহার করলো নভসির স্বপ্নকে, 'শেষমেশ সেই পনেরো আনার দলেই ভিড়ে যাবে এ কিন্তু আমি ভাবিনি নভসি। উচ্চশিক্ষা দিয়ে তোমাদের কী হয় আমি বুঝি না! এটা ঠিকই আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উচ্চাশার কোন সংস্রব নেই! সেই গড্ডালিকা প্রবাহ এ-দেশে চিরকাল চলেছে, চলবে! একটা মানুষের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশবে, মনের সমস্ত আড়াল ঘুচিয়ে দিয়ে মনের মতো একটা মানুষের সঙ্গে মনেপ্রাণে বোঝাপড়া ক'রে নেবে, তা না আগেই তোমাদের চিন্তা এসে যায় বিয়ে হবে কি না হবে! যাও বাছা তার চেয়ে বাবাকে বলোগে, আমার বয়স হয়েছে আমায় জন্যে রাঙা দেখে একটা বর নিয়ে এসো!'

মুখটা ভীষণ গম্ভীর ক'রে পান্নু ঘরে ঢুকলো পর্দা ঠেলে। তার হাতে ট্রে-তে চায়ের সরঞ্জাম আর বিস্কুট।

নভসির মুখের চেহারা দেখে অলকা থমকে গেছে। তার মুখের এই রূপের সঙ্গে সে ভালোই পরিচিত। ভালোই জানে যে ঐ সুন্দর অনভিজ্ঞ লাজুক মুখখানা থেকে নম্র রেখাগুলো মিলিয়ে গিয়ে চিবুকের নিচে যখন কঠিন স্পষ্ট একটি ভাঁজ পড়েছে তখন এবার তাকে থামতে হবে।

পান্নু চ'লে গেছে। অলকা খুব একটা পোশাকী উৎসাহের সঙ্গে চা বানাতে লেগে গেলো।

'আমি করছি'—নভসি বললো সহজ শান্তভাবেই, 'দিন আমাকে দিন।'

'তুমি করবে? তা করো। চা অবিশ্যি বেরুবার সময় খেয়ে বেরিয়েছি, তা বাদলা দিন, আর এক কাপ মন্দ হবে না। আরে! তোমার হাতে না পলা ছিলো? এটাও তো বেশ সুন্দর। কী পাথর? পোখরাজ, না? কবে ধারণ করলে? মন্ত্রপূত ক'রে নিয়েছো? অ্যাঁ? মন্ত্রপূত ক'রে নিয়েছো? নাওনি? তা'লে? এমনি-এমনিই পরলে? কোত্থেকে নিলে? অ্যাঁ?'

'আমার এক মামা মালয় থেকে এনেছেন।'

'সুট করেছে?'

'কি জানি।'

'ভারী সুন্দর পাথরটা। দামী জিনিস। তোমার কোন্ মামা? ঐ যিনি ডাক্তার, না? তিনি ফিরেছেন তাহ'লে। বিয়েটা কবে গো?'

'এই তো কদিন আগে হয়ে গেলো।'

'তাই নাকি'—বিস্ময়ে কলরব ক'রে উঠলো অলকা, 'তাই বলো। অ্যাঁ, বিয়েটা হলো তাহ'লে। কী আশ্চর্য। আঃ, চা-টা বেশ বানিয়েছো তো। এখন সোনার দর কত—জানো না তো, না? ছেলেমানুষ! কিছু সোনা বিসর্জন দিতে হবে। কী করব্ বলো, উপায় নেই। সংসারের ধাক্কা সামলাতে-সামলাতেই গেলাম। আচ্ছা হ্যাঁ ভালো কথা নভসি, যে জন্যে আসা, আমি কিন্তু খুব একটা দরকারে প'ড়ে এসেছি। তোমাকে একটু ভোগাব ভাই। কী, হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলে যে? রাগ করেছো? নাঃ সত্যি তুমি এখনো সেই নভসিই আছো, একদম ছেলেমানুষ। আরে দিদিরা একটু বকাবকি করেই, সে অত ধরতে গেলে চলে। নাও জানলাটা এবারে খুলে দাও তো বাছা, দেখি বাইরের অবস্থাটা।'

নভসি উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলো। আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, বৃষ্টি নেই, জোলো হাওয়াটা রয়েছে যদিও।

অলকা টেবিল থেকে নভসির খান-দু-তিন বই টেনে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলো, কিছু-একটা মন্তব্য করতেও বুঝি-বা উদ্যত হ'লো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বই সম্বন্ধে কিছু না ব'লে সে তার নিজের কথাই বেশ যেন একটু তৈরী হয়ে নিয়ে শুরু করলো, একটু চাপা গলায় বলতে লাগলো, 'একটি লোকের একটু সন্ধান নিতে হবে ভাই। তোমার দাদার অফিসের। বলেছে তো অফিসার। নামটা হচ্ছে, শ্যামলিম সিন্‌হা। সে এক আশ্চর্যের ব্যাপার, বুঝলে। অদ্ভুতভাবে আমাদের পরিচয়। রাস্তায় দেখে-দেখে। অফিসে যাবার সময় রোজ দেখা হত রাস্তায়। কতদিন এক বাসেই উঠেছি। তারপর

একদিন কেমন ক'রে যেন আলাপ হয়ে গেলো। শ্যামলিমর সবই ভালো, তবু কী যেন একটা রহস্য আছে। আমার সঙ্গে ধরো মাস পাঁচেকের আলাপ, এবং বলতে গেলে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কিন্তু কী-বা ওর বাড়ির ঠিকানা, বাড়িতে কে-কেই বা আছে—এ-সব ও একদম গোপন ক'রে রেখেছে সব সময়। আমি জানি, ও খুব চমৎকার গিটার বাজাতে জানে, চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে, চমৎকার জ্ঞান আছে ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে—কিন্তু জানিনে কী পর্যন্ত ওর পড়াশুনো, বিয়ে করেছে কিনা বা জীবনে আর কোন মেয়েকে সে ভালোবেসেছে কিনা। না অতীত না ভবিষ্যৎ। শুধু বর্তমান নিয়ে ওর সঙ্গে আমার যা-কিছু বোঝাপড়া। কিন্তু তাও-তো আজ দু-হপ্তা পর-পর দেখা নেই। কেন কে জানে। কোন খবরও দিচ্ছে না। আমি তো আমার বাসার ঠিকানা অফিসের ঠিকানা সবই দিয়েছি ওকে, অসুখবিসুখই যদি ধরো ক'রে থাকে, একটা খবর তো অনায়াসেই দিতে পারে। লোকটা একটু রহস্যপ্রিয়, তা ঠিকই। হয়তো ইচ্ছে ক'রেই আমাকে ভোগাচ্ছে। একটু খেলছে আমার সঙ্গে। তা-ই হবে হয়তো। নয়তো হঠাৎ নিরুদ্দেশের মানে কী। তা তোমার দাদার কাছে একটু খবর নেবে, ও আসে কিনা অফিসে? অ্যাঁ?'

'দাদা যদি না চেনে?'—নভসি একটু দ্বিধা ক'রে বললো।

'চিনবে না? অফিসার তো। তোমার দাদাও অফিসার। অফিসারে-অফিসারে চেনাশোনা থাকবে না? তাই কি হয়। আর কিছু জিগ্যেস করতে হবে না, শুদ্ধু অফিসে আসচে কিনা গত কয়েক দিন, ব্যস। আমার কথা কিন্তু বোলো না কিছু। আমি জানাতে চাইনে যে আমি তার খোঁজতল্লাস করছি। পারবে না এটা করতে?'

'দেখি।'

'তুমি যেন কীর'ম গা করছো না ভাই। অথচ বিষয়টা খুব জরুরী।'

'আমি কালই দাদা কী বলে তা চিঠিতে জানিয়ে দেব আপনাকে।'

'না না চিঠিতে নয়। আমি আসব, বুঝ্‌লে, আমি আসব।'

মনে-মনে নভসি মুসাবিদা করলো: 'দাদা বললো, কই এ-নামে তো কাউকে চিনিনে'—এইই ব'লে দেব? না, একেবারে চিনি না বলা ভুল হবে, চিনি কিন্তু জানি না সে আপিসে আসচে কি আসচে না—এই বলাই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এইরকম বানিয়ে একটা কিছু ব'লে দেওয়া ছাড়া আর গতি কী। দাদাকে এ-বিষয়ে কিছু জিগ্যেস করতে যাওয়া আর

বাঘের মুখে নিজেকে ধ'রে দেওয়া একই কথা। কিন্তু সে-কথা অলকাদি কিছুতেই শুনবে না, প্যানপ্যান করবেই। সেক্ষেত্রে মিথ্যে কথা বলা ছাড়া ভগবান আর কী উপায় রেখেছেন।

'কী ভাবছ, নভসি ?'

চমকে উঠে নভসি ভাবলো, সেরেছে, অলকাদি তো অন্তর্যামী, যদি বুঝে ফেলে থাকে যা ভাবছি আমি! ভীরু চোখে সে তাকালো অলকার দিকে।

'কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ শ্যামলিমর খোঁজে তোমার কী দরকার —দাদা এই সব জেরায় ফেলবেন ভাবছ বুঝি? তা সে-ভয় অবিশ্যি অমূলক নয়।'

চশমা খুলে কাঁচ মুছতে মুছতে অলকা বিষয়টা চিন্তা করতে লাগলো। তারপর বললো, 'আচ্ছা তবে থাক, আমি অন্যভাবে খবর নেব। দেখি আর কোন সোর্স যদি পাওয়া যায়। যাক আমার কথা, তোমার কথা শুনি দেখি। ছেলেটি কে? সতীর্থ? উঁ? বলো না ছাই। বিবাহযোগ কিন্তু তোমার এখন দেখছিনে বাছা! তা-ই যদি ভেবে থাকো তো সে-গুড়ে বালি। বিয়ের ব্যাপারে তোমার একটু ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে, সে-ও আমি ব'লে রাখলাম।'

নভসির চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রোদের একটি সোনালী তীর কোনাকুনিভাবে তখন জানালার ওপর এসে পড়েছে।

৬

শিবেন তরফদার ফাইলে মুখ গুঁজে কাজ করছিলো। ভূমিত্রী এসে দাঁড়ালো পাশে। বোঝা গেলো না শিবেন খেয়াল করলো কিনা।

'কী এত লিখছো? নিজের ফাইল? না বেগার দিচ্ছো? আমার কয়েকটা চিঠি জমে গেছে। এই শিবেন, কথা কানে ঢুকছে না কী, আমার আবার এরিয়ার্স জ'মে গেছে, ক্লিয়ার ক'রে দিয়ো তো, কেমন?'—ভূমিত্রী হাতের পেন্সিলটা দিয়ে শিবেনের হাতে একটা খোঁচা মারলো।

শিবেন নীরবে ঘাড় নেড়ে লিখেই চলেছে। মস্ত একটা নোট তৈরী করছে সে বড়োসায়েবের কাছে পেশ করবার জন্যে। ভূমিত্রীর দিকে সে খোঁচা খেয়েও তাকায়নি একটু, সময় নেই, জরুরী কাজ।

'তোমার ঐ গণেশমার্কা কলম একটুকালের জন্যে ক্ষ্যান্ত দেও না ভাই, উঃ কী ছেলে! একটা দরকারে প'ড়ে এলাম তা গ্রাহ্যিই নেই।'

দরকারের কথা শুনে শিবেন অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে কাজ থামিয়ে মুখ তুললো, বললো তার মজ্জাগত কুণ্ঠার সঙ্গে, 'কী দরকার দিদি?'

'এতক্ষণে বাবুর হুঁশ হ'লো!'

সরল হাসিতে জীবন্ত হয়ে উঠলো শিবেনের সদাম্লান মুমুক্ষু মুখখানা। বললো, 'কিস্সু তোমার দরকার নেই, সব বাজে কথা, কাজে বাগড়া দিতে আসা হয়েছে মিছিমিছি!'

'না গো, দরকার একটু আছে'—ভূমিত্রী মিষ্টি ক'রে বললো, 'প্রভাতবাবুকে একটা কথা বলা দরকার। বিশেষ জরুরী। তুমি একটু যাও না ভাই ওর সেকশনে, গিয়ে বলো আমি তার জন্যে ক্যানটিনে অপেক্ষা করছি।'

দপ করে নিবে গেলো শিবেনের মুখের প্রদীপশিখা। কিন্তু ও সঙ্গেসঙ্গেই উঠলো। ভূমিত্রীর দৃষ্টি থেকে পালিয়ে যাবার জন্যেই যেন সে দ্রুত বেরিয়ে গেলো সেকশন থেকে।

'ভূমিত্রী গুপ্ত আপনাকে ক্যানটিনে ডাকছে। বিশেষ দরকার।'

মৃদু, ভদ্র গলায় প্রভাতের কাছে কথাটা ব'লে শিবেন যে-পথ দিয়ে ভূমিত্রী ক্যানটিনটার দিকে যেতে পারে সে-পথে না গিয়ে অন্য পথে নিজের সেকশনে ফিরলো।

গোটা বারো বাজে, ক্যানটিন এখন নিরালা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দু-চারজন ব'সে আছে এ-টেবিল্গ সে-টেবিলে। ভূমিত্রী এসে দেখলো প্রভাত আসেনি। কোণের দিকের এক টেবিলে সে বসলো। বয় আসতে চা ব'লে দিলো। আসবার আগে সে দূর থেকে দেখে এসেছে যে শিবেন প্রভাতকে খবর দিলো। দেখে, একটু ঘুর পথে সে এসেছে ক্যানটিনে, ভেবেছিলো ইতিমধ্যে প্রভাত এসে তার অপেক্ষায় থাকবে। কিন্তু তা হ'লো না, কেন ? কাল প্রভাত অফিসেই এলো না, তাই বা কেন ? পর্শু রাত্রে ওর অত রেগে যাবার মতো কথা কী আমি বলেছি এমন। প্রভাত তার ফুলকাকীমার সঙ্গে যে ব্যবহার করে এসেছিলো, সে তো আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারিনে। না, কিছুতেই না। কেন কে জানে, সেদিন মনে হয়েছিলো ও বড়ো স্বার্থপর। একটু কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। অস্বাভাবিক একটা অবস্থার মধ্যে প'ড়ে ভদ্রমহিলার মাথাটা বিকৃত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার কারণ অত তলিয়ে অত দরদ দিয়ে যদি প্রভাত বুঝতেই পেরেছে তবুও সে সেই বেচারার জন্যে নিজের এতটুকু অসুবিধে স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে না কেন। তাহ'লে প্রভাত, আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের সঙ্গে তোমার পার্থক্য থাকে কই ! না, এর সদর্থ আমি কিছুতেই করতে পারিনে। চায়ের কাপে খুব অল্প-অল্প চুমুক দিয়েও তো কাপটা নিঃশেষ হয়ে গেলো। কিন্তু প্রভাত তো এলো না ? হৃদয়ের সীমা যতটা প্রসারিত হ'লে জীবনযাপন বেশ স্বচ্ছন্দ, নিশ্চিন্ত, সর্বতোভদ্র মনে হয়, প্রভাতকে তো মনে হয়েছিলো ওর মধ্যে সেই হৃদয় আছে। কিন্তু এখন যে খটকা লাগছে! 'সর্বতোভদ্র' !—কী সুন্দর কথাটা। এই শব্দটির অর্থ ভূমিত্রী দিনকয়েক আগে প্রভাতের কাছেই জেনেছে। অফিসের এক সহকর্মী নিজেদের বাড়ি তৈরী হয়েছে সেই বাড়ির জন্য প্রভাতের কাছে একটি নাম চেয়েছিলো, প্রভাত একটু ভেবে নামকরণ করেছিলো 'সর্বতোভদ্র', শুনে শশাঙ্কবাবু তো বটেই সেও অবাক হয়েছিলো, কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে। প্রভাত বলেছিলো, এই নামে একরকম আলপনা আছে, পুজোর জায়গায় দেয়া হয়, যা সমস্ত দিক থেকেই কল্যাণসূচক। সেই থেকেই বোধ করি যে বাড়ির চতুর্দিকে দরজা আছে, যেখানে আলো হাওয়া অবারিত আর সুস্বাগত তেমন বাসগৃহকেই আমাদের শাস্ত্রে 'সর্বতোভদ্র গৃহ' ব'লে ব্যাখ্যা আছে—তা আপনারা আপনাদের বাড়িটির নাম তা-ই রাখতে পারেন, এর ভেতরের অর্থ লোকে বুঝুক না বুঝুক বাইরের অর্থটাও তো বেশ ভালো। শশাঙ্কবাবুরা কী করেছে ঈশ্বর জানেন, কিন্তু ভূমিত্রী কথাটা শোনার সঙ্গেসঙ্গেই তার স্বপ্নবিধৃত ভবিষ্যতের নিজের-বাড়িটির জন্যে এই নামকরণই সঙ্কল্পবদ্ধ ক'রে

ফেলেছে। কিন্তু কোথায় প্রভাত? হাত উল্টে ভূমিত্রী ঘড়ি দেখলো। মিনিট পনেরো হয়ে গেলো, কতক্ষণ আর এমনি একা-একা ব'সে থাকা যায়। আসবে না? এত অভদ্র হবে সে?

কিন্তু আমারই বা এত কী! খেয়ালখুশির টানে পুরুষমানুষ সবসময় চলবে, মেয়েদের এমন-কী অপরাধ যে ওদের মর্জির সুরে সুর মেলাতেই তাদের সারাটা বেলা কেটে যাবে। আমি যখন ডেকেছি ওর আসা উচিত ছিলো। এটা ভদ্রতার প্রশ্ন। ভূমিত্রী উঠলো। এত সামান্য একটা ব্যাপারে জীবনকে যে এত ভারাক্রান্ত, জটিল, বিরক্তিকর ক'রে তোলে তার সঙ্গে মানুষ নিশ্চিন্তে মিলবে কী ক'রে, সহজভাবে নিশ্বাস নেবে কী ক'রে, নির্ভয়ে বিশ্বাস করবে কী ক'রে। না, আমি ওর সম্বন্ধে প্রথম থেকেই একটা ভুল ধারণার বশে চলেছি। নিতান্ত অকারণেই ওকে আর পাঁচজনার চাইতে বিশেষ মূল্য দিয়েছি। সেই মোহে আমি আচ্ছন্ন হয়েছি যা নির্বুদ্ধিতা, ছেলেমানুষী, অপমানকর। জীবনে একবার তো বেশ চমৎকার ভাবেই হাড়ে-হাড়ে অনুভব করা গেছে যে ভুল-মানুষের সঙ্গে মেল-বন্ধনের শেষ পরিণাম কী। তাছাড়া প্রশ্ন তো অন্য রকমও আছে! মনের দিক থেকে যদি লোকটিকে গ্রহণযোগ্য ব'লে ধ'রে নেয়া যায়ও, তাহ'লেই বা কী! আমার সম্বন্ধে লোকটির কৌতূহল আছে খুবই এটা বিশেষ দুর্বোধ্য নয়, কিন্তু সেই কৌতূহলের শেষে ওর আর কোনও পরিকল্পনার আভাস এখনো পর্যন্ত কিছু পেয়েছি কি।

ভাবনার টানে ভূমিত্রী প্রভাতের সেকশনেই ঢুকে পড়েছে খেয়াল করেনি। খেয়াল যখন হ'লো তখন আর ফেরার পথ নেই, কারণ তাহ'লে যারা তাকে এ-ঘরে ঢুকতে লক্ষ্য করেছে তারা মনে মনে হাসবে না!

'আমি আপনাকে ডেকেছিলাম'—ভূমিত্রী প্রভাতের পাশে এসে বললো। কথাটা আর কেউ শুনতে না পায় ভূমিত্রীর এইটেই অভিপ্রায় ছিলো, কিন্তু কথাটা এমনি বিশ্রী জোরে এবং উষ্মার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে তা সে নিজেই ভাবতে পারেনি। অবিশ্যি ভাগ্য ভালো তার যে কথাটা বোধ করি আর কেউ শুনতে পায়নি, যে যার নিজের কাজেই ব্যস্ত।

'ও হ্যাঁ চলুন বাইরে যাই'—প্রভাত ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে, উঠেই বাইরের দিকে রওনা হ'লো।

পেছন-পেছন না এসে ভূমিত্রীর উপায় কী! ঠোঁট কামড়ে ধরে সে প্রভাতের পিছু-পিছু এলো।

'হাতের কাজটা খুব জরুরী ছিলো তাই উঠতে পারিনি'—প্রভাত খুব

ভদ্রভাবে বলার চেষ্টা করলো, 'রাগ করেছেন নিশ্চয়ই ? মুখ দেখেই অবিশ্যি বোঝা যায়। চলুন ক্যানটিনে গিয়ে বসি।'

'ধন্যবাদ। এখন আর সময় নেই আমার। আপনি যান কাজ করুনগে।'

'ও কী দাঁড়ান দাঁড়ান—কী জন্যে ডেকেছিলেন বললেন না তো ?'

'পরে একসময় বলা যাবে।'

'রাগ ক'রে যাচ্ছেন তো ?'

'হ্যাঁ রাগ ক'রেই যাচ্ছি। আপনি এত ছেলেমানুষ আমি ভাবতেই পারিনি। যাই ঘটুক না কেন, ডাকলে যাবেন না এত বোকামি আপনি করতে পারবেন তা কি আমি ভাবতে পেরেছিলাম। যাকগে, চলি এখন আর সময় নেই আমার।'

'অফিসের পরে একসঙ্গে ফিরতে আপত্তি আছে কিছু ? গেটের বাইরে অপেক্ষা করব আপনার জন্যে ?'

'না না।'

ভূমিত্রী উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেলো সেখান থেকে।

অফিসছুটির সঙ্গে সঙ্গে ডালহৌসির বুক থেকে ঢল নেমেছে। বাতাস এলোমেলো বইছে। চৈত্রের বিকেল! ঊর্ধ্বশ্বাসে উজানের টানে চলতে-চলতেও অভিজ্ঞ মানুষ ঘাড় তুলে এক-একবার উত্তর-পশ্চিম আকাশের রঙটা দেখে নিচ্ছে। কি জানি যদি দপ্ ক'রে ওঠে কালবৈশাখী তাহ'লে চূড়ান্ত দুর্ভোগ আছে। মানুষ ট্রাম বাস সমস্ত যানবাহন সব একসঙ্গে যেন ক্ষেপে গেছে। কারো সঙ্গে কারো আর আত্মীয়তা, ভদ্রতা কি বন্ধুত্বের সম্পর্ক নেই এখন, এখন সমগ্র চৈতন্যের একমাত্র হুঁস আত্মরক্ষা, আত্মপরায়ণতার ঠুলিতে অন্ধ হয়ে গিয়েছে সবাই, অফিসছুটির পরে ডালহৌসির এই নির্দয় করুণাহীন ঘূর্ণি থেকে নিজেকে নিরাপদে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া এখন আর অন্য কোন করণীয় নেই।

এরই মধ্যে ভূমিত্রী নিজেকে নিক্ষেপ করেছিলো একটি বাসের দরজার আবর্তে। কিন্তু বৃথা। বাদুড়ঝোলা মানুষ নিয়ে বাসটা চ'লে গেলো। ভূমিত্রী পরবর্তীর অপেক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত করছে এমন সময় প্রভাত এসে হাজির হ'লো তার পাশে।

'চলুন না হেঁটেই চ'লে যাই'—প্রভাত প্রস্তাব করলো।

'হেঁটে ? আর একটা বাস দেখলে হ'ত না ?'

ভূমিত্রীর মুখে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠা বিতৃষ্ণ রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রভাতের মনে ধাক্কা লাগলো।

'আচ্ছা চলুন'—ভূমিত্রী সাধারণভাবেই বললো।

হেঁটে চললো দুজন পাশাপাশি। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। দশটা-পাঁচটা কলম-পেশা দাসত্বের গ্লানি উভয়েরই সমস্ত শরীরে মনে হয়তো-বা অবসাদ আর ক্লান্তি ঘটিয়ে থাকবে, কিন্তু পাশাপাশি অথচ নিরুত্তর এই পথচলার মধ্যে দুজনেরই মুখে পরস্পর যে-রসশূন্যতা লক্ষ্য করছিলো তার সঠিক কারণটা যে কী, সে-বিষয়ে উভয়েরই গুরুতর সংশয় ছিলো।

'ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে'—প্রভাত বলছিলো।

'এখান থেকে তো আর বাসে-ট্রামে ওঠা যাবে না। আজ দুর্ভোগ আছে।'—ভূমিত্রীর উত্তর।

'ট্যাক্সি নেব ?'—প্রভাত জিগ্যেস করলো।

'কোথায় ট্যাক্সি ?'

'এখন ট্যাক্সি পাওয়া—আচ্ছা, রিক্সা ?'

'তাই করুন। ঝড়ে পড়ার চাইতে সেও ভালো।'

এক রিক্সায় দুজনে উঠে বসলো।

স্বভাবতই, এই দেহ-সান্নিধ্যে দুজনেরই মনের অস্বস্তি বাড়লো। সেই স্থূল সান্নিধ্যের প্রতি অনীহায়, পরস্পরের প্রতি সন্দেহে—যা অস্পষ্ট, অনির্দেশ্য, কুয়াশাচ্ছন্ন, অথচ নিয়তিনির্বন্ধে এই সহযাত্রায় দুজনেরই অন্তর্মন খ্যাপা কুকুরের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তবুও তো স্বাভাবিকতার মুখোশ এঁটে রাখতেই হবে, নয়তো প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় মেনে নিতে হয়, যা বর্তমান অবস্থায় উভয়েরই কাছে অসম্ভব মনে হ'লো।

অভিমান-বশেই ভূমিত্রী এমনি ব্যবহার করছে এইটে মনে করতে পারলে অবিশ্যি প্রভাত বেঁচে যেত। ওর রাগ-অভিমানের অভিব্যক্তি তো আগেও আমি দেখেছি, প্রভাত খতিয়ে দেখছিলো, রাগের মাথায় কড়া কথা গরম মেজাজ অথবা শাণিত বিদ্রূপ ইত্যাদিই ওর স্বভাবগত ব'লে জানতাম, কিন্তু আজকের এই ঠাণ্ডা, প্রায়-নির্বিকার, ভদ্রতার নিয়ম-আঁটা অবজ্ঞা-মাখানো মুখের চেহারা কখনো দেখেছি কি।

প্রভাত সরল প্রকৃতির ছেলে নয়, ভূমিত্রী বিচার করছিলো, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, বরং সরলতার চেহারায় যে-নির্বুদ্ধিতা ফুটে ওঠে তা যে

প্রভাতের মুখে আমাকে দেখতে হয় না সে তো সৌভাগ্যই, কিন্তু তাই ব'লে কুটিলতাও তো কাম্য নয়! অথচ এই যে প্রভাত ভয়ানকরকম একটা অন্যায় ক'রেও তার জন্যে লজ্জিত সন্ত্রস্ত হওয়া দূরে থাক, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতার ভান করছে তা কুটিলতা ছাড়া আর কী। এই যে সে অফিসের যত অবান্তর খবর থেকে থেকে দুটো-একটা বলার চেষ্টা করছে, অথচ আমার অগ্রাহ্য করার দরুন কোন কথাই গুছিয়ে বলতে পারছে না, তবুও সে-সব বাজে কথা ছেড়ে কোনরকম ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণামাত্র করছে না তাই বা কুটিলতা ছাড়া অন্য কী হতে পারে। আর, এই এড়িয়ে চলার কী অর্থ। আমার প্রতি কোন গোপন আকাঙ্ক্ষাই কি রাখো না তুমি? এতই তোমার দেমাক!

ঝোড়ো হাওয়ার পাগলামি ইতিমধ্যে শান্ত হয়েছে, নীল আকাশের নিচে নিরাপদ সন্ধ্যার বরাভয়ে মহানগরী এখন স্বাভাবিক। প্রভাত প্রস্তাব করলো রিক্সা ছেড়ে দেওয়া হোক, ভূমিত্রী রাজী। রিক্সার ভাড়া প্রভাত পুরোটাই দিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু রিক্সা চ'লে যেতেই ভূমিত্রী ভাড়ার ঠিক অর্ধেক ব্যাগ থেকে বের ক'রে বললো, 'এই যে রাখুন এটা', এবং প্রভাত মুহূর্তমাত্র দ্বিধা ক'রে পয়সাটা নিয়ে নির্বিকারভাবেই পকেটে রাখলো।

'তারপর? একটু চা খেলে ক্ষতি কী'—প্রভাত।

'এ রেস্টুরেণ্টটা পচা, ঐদিকে ভালো একটা আছে, চলুন।'

রেস্তরাঁর একটি কেবিনে গিয়ে বসতেই বয় এসে পর্দা টেনে দিলো।

'কী খাবেন?'—প্রভাত।

ভূমিত্রী ঈষৎ মুখ মচকালো।

'আচ্ছা দুটো চিংড়ি কাটলেট আর হট কফি'—প্রভাত ব'লে দিলো বয়কে।

'কাটলেট তো আপনার রোচে না, বললেন কেন?'—ভূমিত্রী।

'আপনার তো সাংঘাতিক রোচে।'

'তাতে কী! নিজের জন্যে যা রোচে তা বললেই হ'ত'—ভূমিত্রী বিরক্তি প্রকাশ করলো।

'আমার সব-কিছুই পর-রুচি। পর-রুচি খানা, পর-রুচি পরনা।'

'বোকামির চরম!'

হেসে উঠলো প্রভাত। বললো, 'যাক, এতক্ষণে আপনার মুখ থেকে একটা স্বাভাবিক কথা বেরুলো।'

'তার মানে?'—ভূমিত্রী স্থিরদৃষ্টিতে প্রভাতের দিকে চোখ তুললো।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে প্রভাতের মনে হ'লো, শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে এমনি স্থির হয়ে থাকে যে সেই দৃশ্য দেখেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। ভূমিত্রীর এই দৃষ্টিকে প্রভাত ভয় করে। এর আগে যতবার সে এই দৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছে ততবারই তার শঙ্খচুড়ের স্থির ভয়াল ফণার কথা মনে পড়েছে।

'একটা কথা জিগ্যেস করি আপনাকে'—অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে প্রভাত বললো, 'আপত্তি থাকলে উত্তর দেবেন না। আপনার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে আমার কৌতূহল আছে। আপনি নিজে থেকে কোনদিন কিছু বলেননি ব'লে আমিও কিছু জিগ্যেস করিনি।'

চোখ নামিয়ে ভূমিত্রী বললো, 'হঠাৎ এ-কথা কেন।'

'বলতে বাধা থাকলে এ-প্রসঙ্গ আমি ছেড়ে দিতে পারি।'

'বাধা আছে ভাবছেন কেন।'

'অত কৈফিয়ৎ চাইবেন না, বলতে হয় ব'লে ফেলুন।'

'কী জানতে চান।'

'আপনার স্বামীর সঙ্গে কি আপনি কোন যোগাযোগই রাখেন না।'

'না। তারপর ?'

'আপনাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো কেন ?'

'কেউ কাউকে পছন্দ করিনি ব'লে।'

'কেউ কাউকে নয় ? বলেন কি। আপনাকে তার পছন্দ হয়নি ?'

'না তো। একদম না। কেন, আমি কি খুব পছন্দসই লোক ?'

'সেই লোকটিকে আপনার পছন্দ হয়নি কেন ? কী তার দোষ ?'

'আমাকে তার পছন্দ হয়নি ব'লেই তাকেও আমার পছন্দ হয়নি। এইটেই তার দোষ! তাছাড়া আর কী বলব বলুন। শিক্ষিত সুশ্রী স্বাস্থ্যবান লোক, সচ্ছল বনেদী পরিবার, সেদিক থেকে তো অপছন্দ হবার কোন কারণ দেখিনে।'

'আমি শুনেছিলাম আপনার স্বামী আর শাশুড়ী দুজনেই খুব অত্যাচার করেছেন আপনার ওপর, তাই আপনি পালিয়ে এসেছিলেন একদিন।'

'তাই নাকি! কোথায় শুনলেন এমন কথা।'

'সে যেখানেই শুনি না, সেটা বড়ো কথা নয়।'

'পালিয়ে তো আসিনি আমি। বি, এ, পরীক্ষা দিতে বাপের বাড়ি এসেছিলাম, আর ফিরে যাইনি। আর, অত্যাচার ? অত্যাচার বলতে যা-সব শুনি অনেকের, আমার ওপর তো সে-সব কিছু হয়নি। মারধর গালাগালি সে-সব

কিছুই নয়। তবে এটা ঠিকই ওদের বাড়ির লোকেরা সকলেই যেন কেমন ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ আর নির্বিকার গোছের। আর, বড়ো স্বার্থপর। ঠিক বোঝাতে পারব না আমি, কেমন যেন অদ্ভুত। কারো মধ্যে যেন মন ব'লে কোন পদার্থ নেই। বড় স্থূল। কথাবার্তা চলাফেরা সবই যেন ব্যবসাদারী চালে। দাবী, অধিকার, জুলুম ছাড়া কোন কথাই নেই। বছরখানেক ছিলাম ওদের বাড়িতে, জলের মধ্যে মুখটা ঠেসে ধরলে যেমন লাগে না তেমনি আমার লেগেছে সব সময়। উঃ মানুষ যে কত নিরেট কত আহাম্মক কত অপদার্থ হ'তে পারে, ঐ পরিবারটার প্রায় সবকটা লোকই যেন তাই। আর, সকলের সেরা যেটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। উঃ কী ভয়ানক! ভাবতেও যেন আমার কেমন লাগে, একবচ্ছর ঐরকম একটা লোকের সঙ্গে কাটিয়েছি।'

বয় ইতিমধ্যে খাবার দিয়ে গেছে।

'নিন, খেয়ে নিন'—ভূমিত্রী হালকাভাবে হেসে উঠে বললো।

প্রায় নীরবেই খাওয়ার ব্যাপারটা শেষ হ'লো।

কফিতে চুমুক দিয়ে প্রভাত বললো, 'পরীক্ষা দিতে এসে আর ফিরে যাননি? শুনে আজগুবি ব'লে মনে হয়।'

'কেন? আমি বি, এ, একবছর ফেল করেছিলাম, জানেন? হঠাৎ বিয়ের সম্বন্ধটা হয়ে গিয়েছিলো আমার, দেরী করলে পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে ভয়ে বাবা বিয়েতে দেরী করেননি, অথচ দুমাস পরেই আমার পরীক্ষা। এমন বিশ্রী গোলমাল আর বদমেজাজ নিয়ে পরীক্ষা দিলাম যে দিয়েই বুঝেছিলাম পাসের আশা নেই। ওঃ, সেই ফেল করার জন্যে কী কথাই আমাকে শুনতে হয়েছিলো সেই লোকটা আর তার মায়ের কাছে দিনের পর দিন, উঠতে-বসতে। কী গঞ্জনা, কী নালিশ, কী কাটা-কাটা কথা। জীবনে কোন পরীক্ষায় তার আগে আমি ফেল করিনি, তাইতে ফেল করার জন্যে আমার নিজেরই লজ্জার অন্ত ছিলো না। কিন্তু ফেল করার পর ঐ-দুজনের কথাবার্তা শুনে-শুনে আমার মনে হত কি জানেন, মনে হত আমি ওদের জন্যই পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম, আমার নিজের জন্যে নয়। কথাটা আপনাকে হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু অনেকটা কী রকম জানেন, ঝি-চাকর বাজার থেকে পচা মাছ কিনে নিয়ে এলে বাড়ির কর্তা-গিন্নী যেমন চ'টে গিয়ে লোকসান লোকসান ব'লে আপসোস করে, ওদের ব্যবহারটাও ছিলো তেমনি। পরের বছর পরীক্ষার আগে ওদের কাছ থেকে দু'মাসের ছুটি চাইলাম, বললাম, এই দুটো মাস বাপের বাড়ি গিয়ে থাকি, নয়তো এবারও পাস করতে পারব না। ওরা এককথাতেই রাজী। কিন্তু পরিষ্কার

জানিয়ে দিলো, এবার পাস আমাকে করতেই হবে, ফেল করেছি এ-খবর যেন তাদের আবার শুনতে না হয়!'

'তা এতে, আপনার স্বামী আপনাকে পছন্দ করেনি ব'লে মনে করার কি কোন কারণ আছে? অনেকে একটু জুলুমবাজ হয়, আপনার স্বামী জবরদস্তি ক'রেই—'

'আপনার স্বামী আপনার স্বামী আপনি হাজারবার ক'রে বলছেন কেন। আমার কোন স্বামী তো নেই এখন আর!'

'আচ্ছা তাই হ'লো, সেই লোকটার ধরনই ছিলো অমনি।'

'তেমন লোকের সঙ্গে জীবনটা নষ্ট ক'রে দেবার তো কোন দায় পড়েনি আমার! এখন তো আমি বেশ আছি। বেশ সুখে, স্বচ্ছন্দে।'

'যদি সে আপনাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়?'

'বোকার মতো কথা বলছেন কেন।'

'বোকার মতো? বোধ হয়, না। আপনাকে যদি সে ফিরে পেতে চায় তা'হলে আইনের কী বিধান তা আমি জানি না, কিন্তু এটা বেশ জানি যে সেক্ষেত্রে সমাজ আপনাকে রেহাই দেবে না।'

স্পষ্টতই, ভূমিত্রী শিউরে উঠলো। প্রভাতের দিকে অপলকে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে শেষে বললে, 'কেন? সমাজ কী করবে আমার?'

'আর কিছু নাই পারুক, অন্তত ঐ যে বললেন 'বেশ সুখে, স্বচ্ছন্দে' আছি, সেটি থাকতে দেবে না। আপনার চূড়ান্ত অশান্তি ঘটিয়ে ছাড়বে।'

'কেন?'

'কেন কি! আপনি সে-লোকটির সঙ্গে একটি বৎসর কাটিয়ে এসেছেন সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন।'

'তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে!'—ভূমিত্রী দপ ক'রে জ্ব'লে উঠে বললো।

প্রভাতকেও বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ যেন সে মুখের রাশ টেনে ধরলো। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বিলটা পড়তে লাগলো।

'কেন আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন এর'ম ক'রে। কী আমি করেছি আপনার!'—ভূমিত্রীর গলায় যেন অসহায়তা ধ্বনিত হ'লো।

'চলুন ওঠা যাক'—ব'লেই প্রভাত উঠে পড়লো। কাউণ্টারে গিয়ে পয়সা মিটিয়ে দিলো। তারপর রাস্তায় এসে বললো, 'আজকে আপনার সঙ্গে কেবল ঝগড়াই করছি। খুব খারাপ দিন আজ।'

'আপনি এ-সব কথা কেন আমাকে বললেন'—ভূমিত্রী কৈফিয়ৎ তলবের ভঙ্গীতে বললো, 'তা আমাকে বলতে হবে। চলুন পার্কে গিয়ে বসি। না, চলুন, এ-সব কথার অর্থ কী আমার বোঝা দরকার।'

'আমি যা বলেছি তার চাইতে বেশি কিছু বলা, আজকে আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়'—প্রভাত বললো, বেশ ঋজুভাবেই।

'আপনার কথাবার্তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! কী আপনার বক্তব্য বলুন তো!'

ভূমিত্রীর মুখের চেহারা দেখে প্রভাত ভয় পেলো।

'আপনি এত রেগে যাবেন জানলে এ-সব কথা আমি তুলতাম না'—বললো প্রভাত।

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে'—ভূমিত্রী কর্কশ গলায় বললো, 'আমি যে আমার বিয়ে আর ঐ লোকটাকে বাতিল ক'রে দিয়েছি, সেটা আমার অন্যায় হয়েছে!'

প্রভাত অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলো এ-কথা শুনে। বললো, 'আমি কি সেরকম কিছু বলেছি?'

'নয়তো সমাজ আর ঐ লোকটার জন্যে ওকালতি করছেন কেন?'

'করেছি তা?'—প্রভাত কী চিন্তা করলো একটুকাল, তারপর হেসে বললো, 'তা যদি ক'রে থাকি তাহ'লে তা করেছি সেটাই মানুষের স্বভাব ব'লে। নিজের স্বার্থ জড়িত না থাকলে অন্যের পক্ষে ওকালতি করাটা আপনার-আমার এবং হয়তো পৃথিবীর সকলেরই স্বাভাবিক প্রবণতা! দিন দু-তিন আগে যেমন আপনি আমার বিরুদ্ধে ফুলকাকীমার জন্যে ওকালতি করেছিলেন! যে-অনুশাসন জারী করলে নিজের কোন স্বার্থহানির আশঙ্কা নেই অথচ অপরের শায়েস্তা হবার বিধান আছে তাকেই না বলে 'সামাজিক অনুশাসন'! তা যাকগে সে-তর্ক। আমার মনে হয়, যাকে আপনি বাতিল করেছেন তার জন্য ওকালতি করার আমার কোনই মাথাব্যথা নেই। অবিশ্যি আপনার এই কথা শুনে আমার মনে সাংঘাতিক একটা খটকা লেগেছে, কিন্তু সে-সম্বন্ধে নিজেই আমি ভালো ক'রে ভাবতে চাই, তার আগে এ-বিষয়ে আর কিছু বলা আমি উচিত মনে করছি না।'

ভূমিত্রী মুখ কালো ক'রে বললো, 'ভালো কথা!'—হাত উল্টে ঘড়ি দেখে বললো, 'অনেক বেজে গেছে। আটটা! আমি চলি তাহ'লে।'

এভাবে বিদায় নিতে প্রভাতের ভালো লাগলো না। ভূমিত্রী পার্কে বসবার প্রস্তাব করেছিলো, সেই কথাটাই সে তুলবে কিনা ভাবলো, কিন্তু আজকে যে

প্রসঙ্গ উঠে পড়েছে অতর্কিতে, কথার পিঠে কথা লাফিয়ে উঠে যেখানে গড়িয়ে গেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস—বিশেষত পার্কের অন্ধকারে, অত নিভৃতে, অত কাছাকাছি—আজকে আর তার সাহসে কুললো না শেষ পর্যন্ত। গম্ভীর বিবর্ণ মুখে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো সে একটিও কথা না ব'লে।

ভূমিত্রী মুখ নিচু ক'রে হয়তো-বা প্রভাত কিছু বলবে প্রত্যাশায় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো। তারপর অস্ফুটে আর একবার বিদায়বাণী উচ্চারণ ক'রে দ্রুত চলতে শুরু করলো নিজের বাড়ির দিকে।

৭

ভূমিত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভাত অলস নিরুদ্যম পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলো। হঠাৎ রাস্তার ভিড়ে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো শিবেন তরফদারের সঙ্গে।

এই লোকটিকে প্রভাত সর্বদা এড়িয়ে চলে। অফিসে একে দেখছে সে দশ-বারো বছর ধ'রে। অন্য সেকশনের লোক হওয়া সত্ত্বেও সে শুনেছে, কাজেকর্মে বিশ্বস্ততায় নিয়মানুবর্তিতায় সমস্ত অফিসে তার জুড়ি নেই; শুনেছে যে এমন শান্তশিষ্ট স্বল্পভাষী গোবেচারী এ-যুগে দুর্লভ; সত্যবাদিতায় সে যুধিষ্ঠিরকেও লজ্জা দেয় এবং অফিসের কাজে অন্যের বেগার খেটে দেবার বা মাসের শেষে ঠেকা-বেঠেকায় দু-চার টাকা চালিয়ে দেবার মতো ব্যাপারে বিপত্তে-মধুসূদন হিসেবে শিবেন তরফদারকে এ-অফিসে অনেকেই বিশেষভাবে স্মরণ করে। বহুকাল ধ'রে প্রভাত দেখে আসচে যে এই লোকটা সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিতান্তই নির্জলা ভালোমানুষ, কিন্তু ওর নির্জীব বিষণ্ণ অতিমাত্রায় ধীর-স্থির চলাফেরা কথাবার্তার দরুন তার প্রতি সে বরাবরই বিতৃষ্ণা আর বিরাগ বোধ ক'রে এসেছে। কোন দিনই হয়তো প্রভাত ওকে নিয়ে কিছুমাত্র মাথাও ঘামাত না, যদি না এ অফিসে বছরখানেক আগে ভূমিত্রী আসবার পরে এবং গত মাস তিনেক ধ'রে ভূমিত্রীর মুখে ওর সম্বন্ধে নানান গল্প দিনের পর দিন শুনতে হত। ভূমিত্রীর কাছে প্রভাত শুনেছে, শিবেনের মতো ছেলে হয় না। কিন্তু কী লাভ বলো, যাকে দেখার সঙ্গেসঙ্গেই মনের মধ্যে প্রথমে জাগে করুণা, পৌরুষের স্পর্শবর্জিত সেই গুণাবলী প্রভাতের মতে ক্লীব। এবং ক্লীবত্বের সেই আধারকে যদি ভূমিত্রীর মতো মেয়েও প্রশংসাবাণীতে অভিষিক্ত করে, তাহ'লে প্রভাত, অন্তত সেই ব্যাপারে, স্থূল স্বার্থবুদ্ধির সন্ধান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।

'আরে? এদিকে কোথায়?'—ব'লে প্রভাতই থমকে দাঁড়িয়ে না গেলে শিবেন নিঃসন্দেহে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেত।

শিবেন স্মিত শান্ত মুখে কী বলবে প্রথমটা যেন ঠিক করতে পারলো না, একটু ইতস্তত ক'রে শেষে বললো, 'ভূমিত্রীদির বাড়িতে যাচ্ছি। আপনি যাবেন না?'

'কেন ?'—ব'লে প্রভাত লক্ষ্য করলো শিবেনের কাপড়জামায় সামান্য কিছু পারিপাট্য আছে এবং হাতে তার কাগজে-মোড়া একগোছা রজনীগন্ধার ডাঁটা।

'ভূমিত্রীদির জন্মদিন আজ'—শিবেন বললো। সরল এবং সহজভাবে।

'ও। তাই নাকি ? তা যান, আমার তো নেমন্তন্ন জোটেনি !'—প্রভাত হাসলো।

'নেমন্তন্ন ? সে কি আমারই হয়েছে। দিদি জানেনও না যে আমি যাব। তিনি তো আর বলেননি আমাকে।'

'তবে কী ক'রে জানলেন'—প্রভাত অবাক।

'তারিখটা জানতুম আমি।'

'ও, আচ্ছা যান। আমি চলি। আচ্ছা এক কাজ করবেন। ওঁকে বলবেন, আমি যদি জানতাম যে আজ তাঁর জন্মদিন তা'লে তাঁর সঙ্গে কিছুতেই ঝগড়া করতাম না। অফিসের পরে আমরা একসঙ্গেই ফিরেছি। এতক্ষণ আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এই একটু আগে বাড়ি গেলো।'

'দিদির তো ঝগড়া-করা স্বভাব নয়'—শিবেন হেসে বললো।

'তাহ'লে আমারই দোষ !'

'আচ্ছা তাই বলব'—শিবেন এবার হাসিতে উচ্ছলিত হ'লো।

বিদায় নেবার পর প্রভাতের চোখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বারবার ভেসে উঠতে লাগলো শিবেনের শীর্ণ নিষ্প্রাণ মুখে সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখদুটির মধ্যে কী আশ্চর্য এক দ্যুতি।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে প্রভাত থমকে গেলো—ফুলকাকীমা শুয়ে আছে ঘরের মধ্যে খালি মেঝের ওপরেই, আলুলায়িতকুন্তলা, বিস্রস্তবসনা, আর তার গা ঘেঁষে ব'সে আছে তার ছ' বছরের মেয়ে পরা—ফুলকাকীমার ঝরাপাতা! চোখ খোলাই ফুলকাকীমার, তার সঙ্গে চোখাচোখিও হ'লো, কিন্তু সে-চোখ যেন দৃষ্টিহীন, নির্বিকার! যেন দেখতেই পেলে না তাকে।

'কী ব্যাপার !'—প্রভাত উষ্মা প্রকাশ করে মা'র কাছে গিয়ে।

'এই তো ব্যাপার !'—হিরণ্ময়ী হাত নেড়ে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'এবারে পার্মেনেন্ট হয়ে বসলেন ইনি। ও-বাড়ি নাকি নরক আর এ-বাড়ি স্বর্গ! তাই স্বর্গে এসে খুঁটি গেড়ে বসলেন এবার !'

'তা আর বসবে না কেন, আপন ভালো যে পাগলেও বোঝে। ও কি কম স্যায়না !'—সুনয়নী বললেন ঝেঁকে ঝেঁকে, 'গোটা সন্সারটা জ্বাল্যেপুড়্যে খেয়ে,

এখন হদিস পেয়েছো এইটে তোমার স্বর্গ! ঝাড়ু মারো কপালে। ঘেন্না ঘেন্না! ছাখো এখন কী হয়—এ গয়ার পাপ বিদেয় করতে ভোগ আছে বাছা এই ব'লে দিলাম।'

ঘরের একপাশে ইজিচেয়ারে শান্তিদেব বই নিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ধমকে ব'লে উঠলেন, 'বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছো তোমরা। সব কিছুরই একটা সীমা রাখা দরকার।'

ঘরের অন্যপাশে হেঁসেল থেকে হিরণ্ময়ী স্বগত মন্তব্য করলেন, 'সীমা রাখা দরকার! কিন্তু আমার বেলা তো সারাটা জীবন ধ'রে দেখে আসছি সীমা-পরিসীমার কোন্ বালাই নেই!'

'চুপ!'—শান্তিদেব চিৎকার ক'রে উঠলেন।

হ'লো না জামা খোলা, নিঃশব্দে প্রভাত ফের বেরিয়ে গেলো। ছাদে গিয়ে জলের ট্যাঙ্কটার ওপর শুয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো ক্লান্তির ভারে সর্বশরীর কী পরিমাণ আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো। গ্লানি আর হতাশায় নিরালম্ব মন মহাশূন্যে আশ্রয় খুঁজলো। আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকারের কৃষ্ণাভ চাদরে ঐ যে মিটমিট করছে শত শত আলো ওগুলো তো প্রতীক মাত্র! একই সঙ্গে আশা এবং নিরাশার!

প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও প্রভাত, মনের মধ্যে যে-ছবিটা বারবার ভেসে উঠছিলো, তাকে ঠেলে ডুবিয়ে দিতে পারছিলো না। ঘরের মধ্যে সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে প'ড়ে আছে একটা মানুষ আর তার পাশে নিশ্চল নির্বিকার মুখে ব'সে আছে ছ' বছরের একটি শিশু! ঐ যে অত তারা আকাশে তাদের সঙ্গে ঐ মানুষটার নিবিড় আত্মীয়তা আছে, কুটুম্বিতা আছে!

সেই কুটুম্বিতার সূত্রেই না ওদের কারো কারো সঙ্গে আমার পরিচয়! এটা তো চৈত্র মাস, তাহ'লে ফুলকাকীমার প্রিয়তম তারা চিত্রা এখন আকাশে আছে। চৈত্রের রাতের আকাশে সে-ই তো রাণী, ফুলকাকীমার মনের আকাশে সে-ই উজ্জ্বলতম, মোহনতম, পরম আকাঙ্ক্ষিত। কোথায় সে?

বিশেষ খুঁজতে হ'লো না। মাথা না তুলেই, পূব-দক্ষিণ আকাশের উঁচু দিকেই, প্রভাত ফুলকাকীমার নীল স্বপ্নকে খুঁজে বের করলো।

অসুরেরা মর্ত্য থেকে স্বর্গে পৌছবার জন্যে স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে লেগে গিয়েছিলো। কিন্তু দেবতাদের চক্রান্তে, বিশ্বাসঘাতকতায়, হীন আচরণের ফলে—সিঁড়ি যখন প্রায় স্বর্গে গিয়ে ঠেকেছে তখন তা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে প'ড়ে গেছে! ধূলিসাৎ হয়েছে স্বপ্ন! ভাঙা সিঁড়ির গোড়া থেকে, সেই ব্যর্থ স্বপ্নের গর্ভ থেকে,

জ্যোতির্ময় এক নীল আকাঙ্ক্ষা শাশ্বত হয়ে ফুটে আছে ঐ মহাশূন্যে। তারই নাম চিত্রা। ভাঙা সিঁড়িটার দুটো ইটও আকাশে আছে—কোথায় তারা? ঐ যে, চিত্রার মাথার ওপর উত্তরে, সপ্তর্ষির নিচে।

'ও আমারই কথা বলছে চিরকাল ধ'রে। চিরকাল ধ'রে বলবে। সেই জন্যেই ও আমার এত প্রিয়। তাইতো ওকে দেখলেই মনে হয় ও আমার মনের প্রতীক, জীবনের সাক্ষী'—চিত্রাকে চিনিয়ে দিয়ে ফুলকাকীমা বহুকাল আগে একদিন বলেছিলো প্রভাতের মনে পড়লো।

সেই সাক্ষী এখন আকাশে হাজির।

কিন্তু বিচার হবে কোন দরবারে? কে-ই বা বিচারক।

এমনি অলস, অসাড় দার্শনিকতার ঢেউয়ে-ঢেউয়ে যে প্রভাত কতক্ষণ ভাসলো!

অবশেষে উঠে প'ড়ে যখন সে ঘরে ফিরে এলো তখন রাত এগারোটা।

দেখলো তার জন্যে ভাত বেড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। জামা খুলে প্রভাত ব'সে যায় খেতে।

দুটি তো ঘর। শোয়া-বসা-রান্না সব কিছুই তারই মধ্যে। শুয়ে পড়েছে সবাই। মেঝেতে ঢালাও বিছানা দু-ঘরেই। কোথাও পা ফেলবার জায়গা নেই। সবাই শুয়ে পড়লেও দু-ঘরেই এখনো আলো জ্বলছে। কেননা ও-ঘরে মা, প্রভাত অনুমান করলো, হয়তো-বা হিসেব লিখছেন অথবা ডিটেকটিভ পড়ছেন। সকন্যা ফুলকাকীমার বিছানা হয়েছে ও-ঘরে, মা'র পাশেই—তাও প্রভাত দেখে এসেছে।

কিন্তু যা ভয় করেছিলো প্রভাত, তা-ই হ'লো। ফুলকাকীমা উঠে এসে বসেছে তার সামনে।

প্রভাত থালার ওপর ঝুঁকে নীরবে খেয়ে চললো।

'আরো দুটি ভাত লাগবে তোমার। তাই না? ও কী, ওর'ম ক'রে মাছ খোঁটে নাকি। কাঁটা বেছে মাছ খেতে এখনো পর্যন্ত শেখোনি! বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখছি তুমি একটা কাণ্ডই করবে। দেব আমি কাঁটা বেছে?'

প্রভাতের ইচ্ছে হয় ভাত ফেলে উঠে যায়। কিন্তু অতটা করা বোধ হয় উচিত হবে না ভেবে, মুখ গোঁজ ক'রে সে মাথা নাড়ে, মাছটা চটপট সেরে ফ্যালে। গোগ্রাসে কোনরকমে খাওয়াটা শেষ ক'রে সে ছিটকে বেরিয়ে যায় আঁচাতে। ফিরে এসে দেখলো, ফুলকাকীমা ততক্ষণে তার এঁটো বাসনকোসন নিকিয়ে নিয়ে বারান্দায় যাচ্ছে।

এই দৃশ্যটায় প্রভাতের মনের করুণাগ্রন্থিতে একটা মোচড় লাগে। বুঝি-বা

দ্বিধায় প'ড়ে যায়, ফুলকাকীমার সঙ্গে যাই হোক একটু কথা বলা উচিত। কিন্তু সে-ইচ্ছের বেলুন চুপসে যেতে বিশেষ দেরী হয় না। শেলফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে সে শুয়ে পড়লো তার বিছানায়।

বই মুখে ক'রে সে বারান্দায় বাসনমাজার শব্দ শুনতে লাগলো।

তারপর যখন বুঝলো এইবার ফুলকাকীমা ধোয়া বাসনগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকবে অমনি সে বই ফেলে দিয়ে ঘুমের ভান করলো।

একটু পরে শুনতে পেলো ফুলকাকীমা বলছে গলা তুলে, 'দিদি, এরা তো এ-ঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আলোটা নিবিয়ে দেব ?'

'দাও'—উত্তর এলো মা'র, 'ওদিকের দরজাটা বন্ধ আছে তো ?'

'না তো'—ফুলকাকীমা বললো, 'আচ্ছা দিচ্ছি বন্ধ ক'রে।'

দরজা বন্ধ ক'রে আলো নিবিয়ে ফুলকাকীমা ঘর থেকে চ'লে যাবার পর প্রভাত তখন নিশ্চিন্তে ঘুমের কথা ভাবতে পারলো।

মধ্যরাত্রে প্রভাতের ঘুম ভেঙে গেলো। মাধবীলতার কান্না আর সুনয়নীর বকাবকিতে। দরজার ফাঁকে আলো দেখে বুঝলো ও-ঘরে আলোটা জ্বলছে। ফুলকাকীমার বুক-খালি-করা কান্না সমানে চলেছে। বাবা ধমকে উঠলেন প্রভাত শুনলো। ধমকে উঠলেন মা। তারপর ঠাকমা। কিন্তু কান্না থামবে ব'লে কোন লক্ষণ নেই। গভীর রাত্রে এমনি গোমরানো কান্না অন্ধকারকে ক্লেদাক্ত কুৎসিত বিভীষিকাময় ক'রে তুলেছে। কেন এই কান্না তা জানতে প্রভাত কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করে না। কেননা, এরকম উপদ্রব যে আজ রাত্রে কপালে আছে সে তো জানাই ছিলো!

বালিশে এক কান এবং হাতের তেলোয় আরেক কান চেপে ধ'রে প্রভাত কান্নার অসহ্য শব্দটার হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করলো। প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো ফের ঘুমিয়ে পড়তে। সে-চেষ্টা শুধু আরো বেশীমাত্রায় জ্বালা ধরিয়ে দিলো তার চোখে, কানে, মাথার মধ্যে, সমস্ত শিরা-উপশিরায়। ক্রমে প্রভাত একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে উঠে বসলো।

'উঃ উঃ ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন, ও মাগো, আমি কি মানুষ না ? ও মা'—এই আর্তনাদ শুনে প্রভাত অনুমান করলো ঠাকমা নিশ্চয়ই ফুলকাকীমাকে চুলে ধ'রে ঝাঁকাচ্ছেন।

'ও কী মা ও কী। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও'—বাবার কঠোর ধমক ধ্বনিত হ'লো।

'কল্লার ঘাড় বোল্লায় ভাঙে'—ঠাকমার গলা ফের শোনা গেলো, 'ফের ফোঁসফোসানি! ফের ফোঁসফোসানি! চুপ চুপ মাগী, খোতা মুখ থেঁতলে ভোঁতা ক'রে দেব একেবারে হামানদিস্তে দিয়ে।'

'যথেষ্ট হয়েছে'—এবার মা'র গলা, 'এবার শুয়ে পড়ো তো। নাও শুয়ে পড়ো, আলো নেবাব।'

'আপনার দুটি পায়ে পড়ি দিদি, আলো নেবাবেন না। আলো নেবালে আমার বড়ো ভয় করে। মনে হয় কালো কালো ছায়ারা সব আমার চারিদিকে ভিড় করছে, কঙ্কালের মতো সব হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমার গলা মুখ চেপে ধরছে। আর আমার ঝরাপাতাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে যাবার জন্তে ওরা যেন ফিসফিস ক'রে কী সব বলাবলি করে। আলোটা জ্বালানো থাক, আপনার দুটি পায়ে পড়ি দিদি।'

আলোটা তা-সত্ত্বেও নিবে গেলো প্রভাত দেখলো।

সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ।

কিন্তু সে মিনিট কয়েক মাত্র। আলোটা ফের জ্ব'লে উঠলো। ফের শুরু হয়ে গেলো গোলমাল। কিছুক্ষণ খিটিমিটি চেঁচামেচির পর আলো আবার নেবে। একটু পরেই আবার জ্বলে। আবার নেবে, আবার জ্বলে। এমনি ক'রে বারকয়েক। এমনি করেই রাত গড়াতে থাকে,—এবং অবশেষে প্রভাত দেয়ালঘড়িতে তিনটে বাজতে শুনলো। শরীরের সমস্ত স্নায়ু উত্তেজনার চরমে পৌঁছেছে, এখন আর ঘুমের কোন প্রশ্নই আসে না। অন্ধকারের মধ্যেও প্রভাত স্পষ্টই বুঝলো প্রতনুও জেগে আছে। অন্ধকারের এই কুৎসিত, অসহ্য, বিষাক্ত চরিত্রের সঙ্গে প্রভাতের ভালোই পরিচয় আছে। এ অন্ধকার স্থির নিস্তরঙ্গ কিন্তু উষ্ণ, প্রেতগ্রস্ত, দয়াহীন। অন্ধকারের এই কঙ্কাল প্রভাতের বুকের ওপর এসে যেন চেপে বসলো। এই অবাঞ্ছিত অশরীরী আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টায় প্রভাত উঠে প'ড়ে ঘরময় পায়চারি শুরু করলো। দরজা খুলে দিলো, হাওয়া আটকে আছে ঘরে মনে হ'লো তার, বেরিয়ে যাক হাওয়া—নতুন হাওয়া আসুক।

কিন্তু ও-ঘরের গোলমাল আবার বেড়েছে ইতিমধ্যে। মনে হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ে এবার। আলো জ্বলছে। কেমন যেন ধস্তাধস্তির শব্দ। প্রভাত দ্রুত স'রে এলো দু-ঘরের মধ্যবর্তী ভেজানো দরজার কাছে।

মাধবীলতার লম্বা চুলের গোছা ধ'রে টানতে টানতে সুনয়নী তখন তাকে বাইরে বেরুনোর দরজার কাছে নিয়ে গেছেন। প্রভাত দেখলো, ফুলকাকীমা

প্রতিরোধের কোন চেষ্টাই করছে না, শাশুড়ীর দয়ার ওপর সে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে। দৃশ্যটা যেন সেখান থেকে প্রভাতকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলে।

'বাইরে বের ক'রে দিয়ে কী সুবিধে হ'লো। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলে ইজ্জৎ কি বাড়বে!'—প্রভাত শুনতে পেলো বাবা বললেন।

'আরে থাক না বাইরে দু-দণ্ড। দেখছিস না, বাইরে বের ক'রে দিইছি আর টুঁ শব্দটি করছে না! সেয়ান পাগল বুঁচকি আগল! কুকুরের লেজে ঘি দিলে সোজা হয় না, বুঝলি, কুকুরকে চাই মুগুর!'—ঠাকমা।

'বস্তিরও অধম হ'লো!'—মা।

প্রভাত টের পেলো এ-ঘরেও আরো কেউ কেউ জেগে গেছে। তাদের নড়াচড়া, অর্ধোচ্চারিত অব্যয় আর ও-ঘরের কথাবার্তা—ওঘরের আলো আর এঘরের অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রভাতের মনের মধ্যে সংসারতত্ত্বসম্বোধি উথালপাথাল হয়ে উঠলো। দার্শনিক সত্তায় প্রভাত ফের গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

কিন্তু হায় রে ঘুম!

'আলোটা নিবিয়ে দেব রে শান্তি?'—ঠাকমা।

'কী পাগলের মতো করছো—আলো নেবাবে কী বলছো। ওদিকে মাধবী সাড়াশব্দ করছে না, কী হ'লো ওর একবার ছাখোগে বাইরে?'—বাবা।

'দেখতে হয় নিজেই দেখুক না! সব বিষয়েই আলগা-আলগা থাকাটাই আসলে বুদ্ধিমানের!'—মা।

'একটা থাবড়া দিলে তবে ঠিক হয়। ইডিয়ট কোথাকারে।'—বাবা।

এর পরবর্তী শব্দপ্রণালী থেকে প্রভাতের মনে হ'লো, বাবা দরজাটা খুললেন, বাইরে গেলেন এবং উচ্চগ্রামে বললেন, 'কোথায় ও? কোথায় মাধবী? আরে মাধবী গেলো কোথায়?'

বাবার চেঁচামেচি শুনে প্রভাতকে বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে বেরুতে হ'লো। ঘরের প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে জেগে গেছে। এমনকি পাশের ঘরগুলির ভাড়াটেদের মধ্যেও কেউ কেউ দরজা খুলে বেরুলো।

কিন্তু কোথায় মাধবীলতা। সারা তিনতলার কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাদ থেকে শুরু ক'রে সারা বাড়িটাই তাকে তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হ'লো—কিন্তু না, কোথাও কোন চিহ্নমাত্র নেই।

'তারপর? এখন তোমরা সবাই মিলে একটা একটা ক'রে চুল উপড়ে ফ্যালো আমার মাথার। ওঃ!'—শান্তিদেব দাঁতে-দাঁতে ঘ'ষে অস্থির বিকৃতগলায় বললেন।

নাটকের এই পর্যায়ে প্রভাত নিজেকে সম্ভবত স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করছিলো, কারণ তাছাড়া পরিস্থিতিটার প্রকৃত তাৎপর্য আর অনুধাবন করা যাচ্ছিলো না।

'কী দেখছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে'—শান্তিদেব চরম উত্তেজনায় বললেন, 'পুলিসের হাতকড়া পড়বার আগে যা ছুটে রাস্তায়, ছাখ খুঁজে পাস নাকি কোথাও। ট্রামের তলায় না বাসের তলায় মাথা দিয়েছে ছাখগে। পারিস তো উদ্ধার ক'রে নিয়ে আয়, আর নয়তো যা জাহান্নামে। ওঃ, মান সম্মান ইজ্জৎ সব আমার গোল্লায় গেলো এদের হাতে প'ড়ে। আর দেখছিস কী হাঁ ক'রে, দে জামাটা দে, দেখি শেষ চেষ্টা ক'রে নয়তো তোরাও গেলি আমিও গেলাম—হা!'—বলতে বলতে শান্তিদেব পাঞ্জাবিটা কোনমতে গায়ে গলাতে গলাতে পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জামা টেনে প্রভাতও তাঁর পিছু পিছু ছুটলো।

রাস্তায় নেমে শান্তিদেব নিজে যান কলেজ স্কোয়ারের দিকে, প্রভাতকে পাঠান চড়কডাঙায় মাধবীলতা বাপের বাড়িতেই গেলো কিনা দেখতে।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়িতে প্রভাত চশমাটা ভুলে এসেছে। একবার ভাবলো ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি চশমাটা, কিন্তু দেখা গেলো কেশব সেন স্ট্রীট বরাবর সে ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে। দূরের জিনিসই প্রভাত ভালো দেখতে পায় না—চশমার কাঁচে তার মাইনাস তিন।

আরে ঐ তো ফুলকাকীমা। প্রভাত আবিষ্কার করলো ফুলকাকীমা রিক্সা ক'রে চলেছে—কিন্তু পাশে ঐ পুরুষটি কে? ছুটে গিয়ে প্রভাত রিক্সাটার পথ আটকে দাঁড়িয়ে যায়। রিক্সাওলা সময়মতো সামলে নেবার ফলে কোন দুর্ঘটনা অবিশ্যি ঘটে না, কিন্তু প্রভাত লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায় যখন দেখলো রিক্সার ভদ্রমহিলা তার ফুলকাকীমা নয়।

'পাগলা হ্যায়'—ব'লে রিক্সাওলা প্রভাতকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো।

এরপর প্রভাত একটু সতর্ক হয়। ভাবে চশমাটা না এনে কী ভুলই করেছি। হনহনিয়ে চলতে থাকে সে চারিদিক দেখতে দেখতে। একটু পরেই তার লক্ষ্যে পড়লো আর একটি নারীমূর্তি। গতিবেগ স্বভাবতই আরো বেড়ে গেলো। হঠাৎ এক কলার খোসায় পা পড়তেই পা হড়কে গেলো, প'ড়ে গেলো সে রাস্তায়। আর তাই দেখে ফুটপাথে শোয়া এক পাগলী খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

প্রভাত ভ্রূক্ষেপ করে না। প্রায় ছুটেই সে সন্দেহভাজন নারীমূর্তিটির কাছাকাছি হ'লো। কিন্তু বৃথা। এও নয়।

এমনি ক'রে প্রভাত সারাটা রাস্তা যেন আলেয়ার পেছনে ছুটে, যখন এসে পৌঁছলো ফুলকাকীমার ভাইয়ের বাসার দরজায় তখন সূর্য উঠে গেছে, রাস্তাঘাট বাড়িঘরদুয়ার সব কিছু জেগে গেছে।

কিন্তু এ-বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে প্রভাতের মনে হ'লো, এ-বাড়ির অন্দরে এখনো রাত আছে, এখনো এরা জাগেনি।

জাগিয়ে কী লাভ? প্রভাত হিসেব করলো, যে-গতিতে সে এখানে এসেছে তার আগে ফুলকাকীমার এখানে এসে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। কারণ তাকেও যদি পায়ে হেঁটেই আসতে হয়, কেননা যেভাবে তাকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে তাতে তার কাছে পয়সাকড়ি থাকার কথা নয়, আর তাই যদি হ'লো তাহ'লে—প্রভাত চিন্তা করলো—এদের জাগিয়ে তুলে, ব্যস্ত ক'রে, কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে কী লাভ। কোথায় আর যাবে, বেলা বাড়লে হয় এ-বাড়ি নয় ও-বাড়ি কোথাও-না-কোথাও তাকে ফিরতেই হবে। বিকারের ঘোরে বেরিয়ে গেছে, বিকারেই ফিরে আসবে—এতে চিন্তার এমন কী আছে।

ভাবতে ভাবতে প্রভাত স'রে যেতে লাগলো সেখান থেকে। হাঁটতে হাঁটতেই সে বাড়িতে ফিরে এলো।

এসে দেখলো শান্তিদেব তখনো ফেরেননি। অন্যান্য কাকাদের ইতিমধ্যে খবর পাঠানো হয়েছিলো, ফুলকাকু ছাড়া আর সকলেই এসেছেন। সকলেই এক-এক দিকে খুঁজতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং সকলেই হতাশ হয়ে ফিরেও এসেছেন।

শান্তিদেব যখন টলতে টলতে ফিরে এলেন তখন সাড়ে আটটা বাজে। এসেই তিনি আরামকেদারাটায় এলিয়ে পড়লেন। বললেন উদ্‌ভ্রান্ত গলায়, 'দেখা পেয়েছি। কলেজ স্কোয়ারে ঘড়িটার কাছে এক বেঞ্চিতে ব'সে আছে ছাখগে যা। যা ছুটে যা। যা। দেরী করলে আবার কোথায় চ'লে যাবে।'

ক্লান্তি আর অবসাদে শান্তিদেব সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন। প্রভাতের ছোটকাকা আর বড়োকাকা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চ'লে যান কলেজ স্কোয়ারে।

এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়ে শান্তিদেব শ্রান্ত ভগ্ন কণ্ঠে যা বলতে থাকেন সবিস্তারে তাঁর চারপাশের রুদ্ধশ্বাস মানুষগুলির কাছে (মাধবীলতার ছ'বছরের কন্যা ঝরাপাতাকে তখন হিরণ্ময়ী একবাটি মুড়িতে ভুলিয়ে রেখেছেন ঘরের অন্যপাশে), তার সার মর্ম হচ্ছে এই :

অনেক খোঁজাখুজি ছুটোছুটির পর শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি গিয়ে বসেছিলেন কলেজ স্কোয়ারের এক বেঞ্চিতে, একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে। আশ্চর্য হয়ে তিনি দেখতে পান তাঁর পাশের বেঞ্চিতেই মাধবীলতা ব'

চুপচাপ। তিনি তখন লাফিয়ে উঠে তার কাছে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয় মাধবী একবার একটু চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালো, কিন্তু তারপরে সে চোখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে মুখ ক'রে ব'সেই রইলো নির্বিকার ভঙ্গীতে। যেন সে চেনেই না তাঁকে, যেন জীবনে কোনদিন দেখেনি পর্যন্ত। শান্তিদেব যখন তাকে উঠবার জন্যে পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন, বারকয়েক সে অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বলেছে: কেন জ্বালাতন করছেন আমাকে, কে আপনি, স'রে যান এখান থেকে। অবাক হয়ে, শেষ পর্যন্ত কোন উপায়ান্তর না দেখে, শান্তিদেব তাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে আসবার জন্যে তার হাত ধ'রে টানাটানি করতে থাকেন। আর তখন মাধবী কেলেঙ্কারি শুরু ক'রে দেয় চিৎকার ক'রে উঠে। চিৎকার ক'রে ক'রে চারপাশে মেলা লোক জমিয়ে ফ্যালে। আর সেই এক হাট লোকের সামনে ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে সে বলতে থাকে, সে কলেজ স্কোয়ারে হাওয়া খেতে এসেছে, কিন্তু কোথাকার-কে এই উটকো বুড়ো এসে তাকে উত্যক্ত করছে, নানারকম ক'রে ফুসলোচ্ছে, বলছে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে। এরকম অভিযোগের পর জনতা শান্তিদেবের ওপর মারমুখী হয়ে ওঠে। তিনি যত তাদের আসল ব্যাপার বোঝাতে চান ততই তারা রুখে-রুখে উঠে যা-তা-সব বলতে থাকে, কেউ-কেউ দুটো-একটা ধাক্কাটাক্কাও তাঁকে মেরেছে। এমনি সময় কপালক্রমে সেই ভিড়ের মধ্যে এসে উদয় হয় তাঁর একটি ছাত্র, ছেলেটি খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অনেক কষ্টে সে সেই মারমুখী জনতাকে বুঝিয়ে উঠতে পারে যে ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং আদর্শবান চরিত্রের জন্য শিক্ষকসমাজে উনি একজন অত্যন্ত মাননীয় বরেণ্য ব্যক্তি। যাই হোক মাধবীকে নিয়ে আসা শেষ পর্যন্ত অসম্ভব বুঝে শান্তিদেব তখন সেই জনতাকেই মাধবীলতাকে কিছুক্ষণের জন্যে আটকে রাখতে অনুরোধ জানিয়ে চ'লে এসেছেন।

অনন্তদেব অর্থাৎ প্রভাতের বড়োকাকা ফিরে এলেন একা।

তাঁর মুখে ফের জানা গেলো, তাঁরা গিয়ে মাধবীলতাকে দেখতে পাননি। দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জটলা করছিলো তারা বলেছে সেই মেয়েলোকটি কারো বাধা না মেনে ঐ রাস্তার দিকে চ'লে গেছে। সোমদেব অর্থাৎ প্রভাতের ছোটকাকাকে সেই রাস্তায় ফের খুঁজতে পাঠিয়ে অনন্তদেব ফিরে এসেছেন।

•

তারপর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং অবশেষে বছরও ঘুরে গেছে—কিন্তু মাধবীলতার কোন খোঁজই আর পাওয়া গেলো না।

খোঁজা হয়েছে কিন্তু তাকে কম না। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে তাকে ভিক্ষে করতে দেখা গেছে খবর পেয়ে অমনি সোমদেব ছুটেছেন সেইখেনে, কলকাতার অমুক গলির অমুক বাড়ির ছাদে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা দেছে—অমনি খুঁজে দেখে আসা হয়েছে সেই বাড়ি, আর এমনকি পুলিস হেপাজতের অসনাক্ত লাসগুলির মধ্যেও মাধবীলতাকে আঁতিপাতি ক'রে খোঁজার ব্যাপারে তার আত্মীয়স্বজন কোনই ত্রুটি রাখলো না।

প্রভাতও খুঁজছে। শুধু বাইরেই নয়, নিজের মনের মধ্যেও, মনের সুবিস্তীর্ণ সীমাহীন মণ্ডলের মধ্যেও সে ফুলকাকীমাকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজছে!

৮

অলকাতিলকা রায় ভাবতেই পারেনি যে নভসির মুখে শেষ পর্যন্ত প্রভাত বোসের নাম শুনবে। প্রভাত বোসকে অলকা মোটামুটি চেনে। আলাপ-পরিচয় বিশেষ নেই, কিন্তু সে প্রভাতকে দেখেছে—দেখেছে এ-বাড়িতেই। তার খবরাখবর শুনেছে নভসিরই কাছে। কিন্তু তা শুনে কিংবা প্রভাতকে দেখে অলকা কখনোই তেমন একটা মাথা ঘামায়নি। প্রভাতের কথাবার্তার ধরন বা নভসির দিকে চোখের চাউনি বা প্রভাত-প্রসঙ্গে নভসির মুখের রঙ-বদল ইত্যাদি অলকা আগে কখনও যে লক্ষ্য করেনি তা নয়, তা সে করেছে। কিন্তু নভসির বয়সের মেয়ের মুখ অলকার মতে শরতের আকাশ, ক্ষণে-ক্ষণে রঙ-বদল বেশ-বদল মেজাজ-বদলই যার স্বভাব। সেখানে তখন লুকোচুরি খেলার পালা বিশ্বের সব-কিছুরই সাথে, নির্বিচারে, সহজ উদারতায়, সকলেরই সঙ্গে। শরতের পালা সাঙ্গ হয়ে সেই মেয়ের মনে যে ইতিমধ্যেই বসন্তের সমারোহ লেগেছে, অলকা তাতেই যথেষ্ট অবাক মেনেছে। তার ওপর আবার প্রভাত? অলকা নভসির মুখের দিকে তাই তখন উদ্দীপ্ত মনোযোগের সঙ্গে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়েছে, মনে-মনে তর্ক তুলেছে নভসির মতো মেয়ের পক্ষে এটা কী ক'রে সম্ভব হ'লো।

এই মানসিক বিতর্কের ফলে অলকার মনে পড়েছে, এই প্রভাতকে দেখে প্রথম-প্রথম তার সঙ্গে আলাপ জমাবার তার কী ইচ্ছেটাই না হ'ত। অলকার অভিজ্ঞতায় প্রভাতের কথাবার্তা চলাফেরার মধ্যে সবচাইতে যেটা লক্ষণীয় সে হচ্ছে স্বাভাবিকতা। লোকটা এত স্বাভাবিক যা সচরাচর দেখাই যায় না, এইই হচ্ছে গিয়ে প্রভাত সম্পর্কে অলকার এক-কথায় বিচার। ফলে, প্রভাতকে একটু বাজিয়ে দেখার বাসনা অলকার প্রবল হয়েছিলো, কিন্তু অলকার প্রতি প্রভাতের ঠাণ্ডা উৎসাহহীনতা অলকার কাছে অপমানকর ব'লে মনে হত। তাই, নভসি উভয়ের মধ্যে আলাপের যে সূত্রপাত ক'রে দিয়েছিলো তা এক-পাও আর এগোয়নি।

প্রভাতের এই আপাত-অসাধারণত্ব তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া যায়, অলকা বিশ্লেষণ করেছে, তাহ'লেও এ তো ভাবতেও পারা যায়নি যে, টাকার গাছের তলায় যে-মেয়ে মানুষ হয়েছে, বিলাস আর সামাজিক প্রভুত্বের ব্যসনের

অগাধ জলে যে-মেয়ে মগ্ন, অলকার ধারণা অনুযায়ী যে-মেয়ে এখনো অনাঘ্রাত, পবিত্র এবং অতএব বালিকামাত্র—সে-মেয়ে কী যাদুমন্ত্রে প্রভাতের মতো 'অন্ত্যজ অচ্ছুৎ নামগোত্রহীন এক সাধারণ' ছেলের হাতে নিজেকে সঁপে দেবার সাহস করে!

মোট কথা প্রভাতের মতো ছেলের সঙ্গে অলকা স্বয়ং প্রেমে পড়তে রাজী আছে কিন্তু নভসির মতো মেয়েকে সে-ব্যাপারে উৎসাহিত করা তার বিবেচনায় নেমকহারামীর সামিল। তার কারণগুলি বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ অলকা নভসির কাছে বলতেও শুরু করেছিল, কিন্তু নভসি সোজাসুজিই অলকার উৎসাহে বরফ-জল ছিটিয়ে দিয়েছে।

'তাহ'লে কিন্তু বাছা তোমাকে দুঃখ পেতে হবে। তার জন্যে তুমি তৈরী আছ তো?'—অলকা বলেছিলো, 'দুঃখের চেহারা তুমি সত্যি সত্যি কখনো দেখোনি ব'লেই এমন অধীর হয়ে পড়েছো, এরপর যখন দেখবে জীবনে কত অপমান কত হতাশা কত বঞ্চনা, তখন পাগল হয়ে যাবে না তো? আত্মহত্যা করতে দৌড়বে না তো?'

বলতে বলতে নভসির মুখের অবস্থার দিকে তাকিয়ে অলকার শেষ পর্যন্ত মায়া হয়েছিলো। ভীরু খরগোসের মতো যেন নভসি কেঁপে কেঁপে উঠছে অলকার মনে হয়েছিলো। অগত্যা সে তখন এইটে মেনে নিয়েছিলো যে নভসির ভবিষ্যৎ নভসিরই হাতে, আপাতত দিদি হিসেবে বন্ধু হিসেবে নারী হিসেবে তার করণীয় হচ্ছে প্রভাতের সঙ্গে নভসির মিলন ঘটিয়ে দেবার জন্যে যতটুকু দূতিয়ালি এখনো প্রয়োজন সেটুকু করা।

'প্রভাতের অফিসে কখনো গেছ?' —অলকা তখন জিগ্যেস করেছে।

নভসি ঘাড় নেড়েছে।

'অফিসের নাম কী? ঠিকানা জানো?'

নভসি ডালহৌসি স্কোয়ারের এক নামজাদা তেলকোম্পানীর অফিসের নাম বলেছে, ঠিকানা বলতে পারেনি। তাতে কিছু অসুবিধে হয়নি, অলকা নিজেও ডালহৌসি স্কোয়ারের এক অফিসে কেরানীগিরি করে, প্রভাতের অফিসের নামেই সে চিনতে পেরেছে। অলকার পরামর্শমতো তখন ঠিক হয়েছে: নভসি অফিস ছুটির কিছু আগে প্রভাতের অফিসে যাবে, প্রভাতকে ডেকে পাঠাবে, প্রভাত এলে ওকে নিয়ে নভসি বেরিয়ে পড়বে এবং ঠিক অতটার সময় অমুক জায়গায় নভসি প্রভাতকে নিয়ে এসে অপেক্ষা করবে—তখন অলকা সেখান দিয়ে যেতে থাকবে, নভসি যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছে এমনিভাবে ডেকে উঠবে অলকাদি ব'লে—তারপর যা করার অলকা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে।

নভসি বিরক্তি বোধ করেছিলো। অলকাদির গায়ে-পড়া হিতৈষণা তার একটুও ভালো লাগেনি। কিন্তু কেন যেন সে এ-সব উপেক্ষা করতেও পারেনি। অলকাদির এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতেও শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু নভসি গিয়ে যদি না পায় প্রভাতকে অফিসে ? তাহ'লে সে কী করবে ? অলকা তখন জিগ্যেস করেছে প্রভাত কোন সেক্‌শনে কাজ করে, সেটা জানতে পারলে আগে থেকে ফোন ক'রে গেলে সব দিক থেকেই নিরাপদ। কিন্তু নভসি সে-সব কিছু জানে না।

'আচ্ছা ঠিক আছে, ও-অফিসে আমার পরিচিত একটি মেয়ে আছে, তার কাছে ফোন ক'রে দেখব যদি সে বলতে পারে প্রভাতের খোঁজ।'

'তার নাম কী ?'

'কার ? আমার বন্ধু ? ভূমিত্রী গুপ্ত।'

নভসির চমক অলকার দৃষ্টি এড়ায়নি। অলকা চেপে ধরেছিলো, ভূমিত্রীর নাম শুনে ওর এমনি চমকে ওঠার অর্থ কী তা পরিষ্কার ক'রে বলতেই হবে। নভসি অগত্যা বলেওছিলো।

'ওর স্বামীটা একটা গাধা'—অলকা সমস্ত শোনার পর বলেছিলো, 'আমি ওর শ্বশুরবাড়ির প্রায় সবাইকেই চিনি। আমাদের পাড়াতেই ওর শ্বশুরবাড়ি। ভূমিত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঐ-বাড়িতে ওর বউ হয়ে আসবার পর। পড়শী সুবাদে। কিন্তু নৃপেন যত গাধাই হোক না কেন, ভূমিত্রীকে সে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলো। এবং এখনও বাসে। যদিও আমি যতদূর শুনেছি, ভূমিত্রী আর ফিরছে না ও-বাড়ি। অবিশ্যি প্রায় মাস ছয়েক ওর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নেই।'

'গাধা মানে ?'—নভসি উৎসুকভাবে জিগ্যেস করেছিলো, 'বুদ্ধি কম ? না লেখাপড়া কম ?'

'না, লেখাপড়া কমটম নয়, সেদিকে আছে, বি. এ. বি. এল. তো। আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করে। উপার্জনও ভালোই তো মনে হয়। গাধামি অন্য ব্যাপারে। মক্কেল ছাড়া বোধ হয় আর কারো সঙ্গে ও কথা বলতে শেখেনি। ওর চালচলন কথাবার্তা বেশভূষা সবই এমন না, সে দেখলেই পিত্তি জ্ব'লে যায়। আমাদের বাড়িতে মাঝে-মাঝে আসে। আমাকে দিদি ব'লে ডাকে।'

'তো সেই লোকটা আবার বিয়ে করে না কেন ?'

'সে না করে ভালোই। আজকাল এমন কোন্ মেয়ে আছে যে ওকে বরদাস্ত করবে !'

'সে নিজে কি আর তা বোঝে ? সে তো চাইবেই—মানে…'

'মানে বুঝেছি বাছা! মানে বুঝতে আমার বাকি নেই! তা এ তো ভালো নাটকের মধ্যে এসে পড়া গেলো! নাটক কী, একেবারে অতিনাটকীয় ব্যাপার! হাঁগো বাছা, আমি জানতুম নভসি আমাদের ভালো মেয়ে, তা তলে-তলে তুমি যে ইতিমধ্যে একেবারে নায়িকা হয়ে ব'সে আছ!'

অলকাদির এ-সব ফাজলামো নভসির আদৌ ভালো লাগে না।

নভসির মুখের দিকে তাকিয়ে অলকা সে-কথা বোঝেনি এমন নয় তবুও 'সীরিয়স' হতে তার সময় লেগেছিলো।

'নৃপেনের তো ষোল আনার ওপর আঠারো আনা গরজ বউকে ফিরে পাবার কিন্তু ভবী যে ভোলে না! নৃপেন চিঠির ওপর চিঠি হাঁকায়, কিন্তু ভূমিত্রী কোন উত্তর পর্যন্ত দেয় না। ভূমিত্রী চাকরিতে ঢোকার পর দিন দুই আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছে। অনেক কথা জিগ্যেস করেছি, ওর মনের কথা বুঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেয়ের মতো মেয়ে ভূমিত্রী, কলজের জোর আছে। হাতের লোহা খুলে ফেলেছে, সিঁথি ধুয়েমুছে সাদা ক'রে ফেলেছে। নৃপেন কিম্বা শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে কোন মেজাজ না কটু কথা না, দিব্যি নিশ্চিন্তে নির্বিকার মুখে ব'লে দিলে, ওসব আর কেন তুলছেন ভাই, ও একটা দুঃস্বপ্ন, ঘুম ভেঙে যেতেই সব ভুলে গেছি!'

নভসির সমস্ত মুখে মেঘের ঘনঘটা লক্ষ্য ক'রেও অলকা ভূমিত্রী সম্পর্কে প্রশংসার উচ্ছ্বাসে নিবৃত্ত হয়নি, বরং খোলাখুলিই সে নভসিকে বোঝাতে চেয়েছিলো যে, এমন মেয়ে যদি কখনো কোন ছেলেকে ভালোবেসে ফ্যালে তাহ'লে সে-ভালোবাসা অগ্রাহ্য করবার মতো ছেলে প্রভাত নয়। অলকা ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলো, প্রভাত সম্পর্কে তার যতটুকু ধারণা আছে তাতে তার বিশ্বাস যে প্রভাতের মতো ছেলের জন্যে ভূমিত্রীর মতো মেয়েই যোগ্য এবং কাম্য জীবনসঙ্গিনী। বিয়ে যদি করতেই হয় তাহ'লে এমনি যোটকই বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর এই ব্যাপারে নভসি অলকাদির সাহায্য কিংবা পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলো। প্রভাতের আপিসে যাওয়া, সেখান থেকে অমনি যোগসাজস ক'রে তিনজনে মিলিত হওয়া, তারপর নভসির হয়ে প্রভাতকে অলকার চেপে ধরা —ইত্যাকার পরিকল্পনা একটু অদলবদল ক'রে, অর্থাৎ ঐ সম্মেলনে ভূমিত্রীকেও যোগাড় করা এবং ব্যাপারটার একটা খোলাখুলি ফয়সলা করার প্রস্তাব অলকা দিয়েছিলো, কিন্তু নভসি অত্যন্ত কঠিন উপেক্ষার সঙ্গে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো।

নভসির বাবা চন্দ্রমাধব ধর আপন উপার্জনে কলকাতায় বাড়ি করেছেন গাড়ী করেছেন এবং সাতটি সন্তানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কুসুমাস্তীর্ণ করেছেন এবং এখনও ক'রে চলেছেন। এখন অবিশ্যি তাঁর প্রধানতম উপার্জন কয়লার কণ্ট্রাক্টারিতে, কিন্তু গণেশঠাকুর ও মা-লক্ষ্মীকে সহায় ক'রে চন্দ্রমাধব জীবনভর এতরকম জিনিষের লেনদেন করেছেন যার একটি পূর্ণ তালিকা রচনা করা হয়তো-বা স্বয়ং চন্দ্রমাধবের পক্ষেও সম্ভব নয়। ফলে, বছরে ছ'বার ষষ্ঠীপুজো নিজের বাড়িতে তিনি করিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু মা-ষষ্ঠীর দাক্ষিণ্যে তাঁর ঘরে যে-সাতটি সন্তানের আগমন ঘটেছে তাদের লালনপালনের ব্যাপারে কখনোই চন্দ্রমাধব প্রত্যক্ষভাবে কিছু করার ফুরসতই পাননি।

অর্থাৎ বাপের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য, সাহচর্য, স্নেহ কী বস্তু তা নভসি জীবনে কখনোই জানতে পায়নি। তাই সে সম্পূর্ণভাবে মায়ের হাতেই মানুষ। আবার এমন মা যাঁর সোহাগ শাসনবর্জিত। শিশু না কাঁদলে মা-ও দুধ দেয় না এই প্রবচন নভসির মা সম্পর্কে পুরোপুরি অচল। বস্তুত কাঁদবার সুযোগ নভসি তার এই বিশ বছরের জীবনে খুবই কম পেয়েছে, এত কম যা মারাত্মক। জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, আরাম আব নিশ্চিন্ততার বেড়াজালের মধ্যে নভসির জীবনের কুড়িটি বছর প্রায় একই সুরে একই ছন্দে কেটে যাবার ফলে নভসি একঘেয়েমি রোগে ভুগছিলো : ইতিমধ্যে সেখানে প্রভাত এসে বেসুরো বেতালা আবহাওয়ার সৃষ্টির উপক্রম করেছে, এই ছন্দপতনে নভসির 'অধঃপতন' ঘটা এমনই কী আর বিচিত্র! মনের এমনিতরো অধঃপতনের কালে যে শতধা বেগের সৃষ্টি হয় তাকে রুখবে কে!

অলকাতিলকা রায় হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

এই ছাত্রীটিকে অলকা এতকাল ভালোবেসেছে, করুণার চক্ষে দেখেছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বাধিত হয়ে থেকেছে, কিন্তু কখনো শ্রদ্ধা করেছে কি। তার বিবেচনায়, কামনার আগুন যে-মেয়ের চোখে জ্বলেনি সে-মেয়ে আবার মেয়ে! সেই নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদনে যে-মেয়ে নিজে পাগল হয়নি, নিজের আশপাশের শিবশক্তিগুলোকে পাগল ক'রে তুলতে পারেনি সে-মেয়ে আবার মেয়ে!

হতাশ হয়ে ফিরে যাবার সময় অলকাতলিকা রায় নভসির চোখে এতদিনে নিষিদ্ধ ফলের অবাধ্য প্রেরণার কালো ছায়া দেখতে পেয়ে তাই কিছু আশাও নিয়ে গেছে। নভসি এতদিনে তার চোখে সাবালিকা হয়েছে। শ্রদ্ধার পাত্রী, ঈর্ষার পাত্রী হয়েছে!

৯

ঠিকানার লেখাগুলো ভিজে গেছে বৃষ্টির জলে। খামের চিঠি। চিঠির বাক্স থেকে চিঠিটা বের ক'রেই প্রভাত বুঝেছে নভসির চিঠি। এই দ্বিতীয়বার। কিন্তু কত দেরী ক'রে এলো। এই চিঠি সে অন্তত দু-মাস আগে আশা করেছিলো। মৌসুমী বাতাস এবার বড়ো দেরী ক'রে এসেছে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসেও কলকাতার আকাশ মেঘমাশ্লিষ্ট হয়নি, তারপর সেই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত জলধারা পৌঁছলো আষাঢ়ের এই দ্বিতীয় সপ্তাহে এবং তখন থেকে সে তার সমস্ত আবেগ নিয়েই তার তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধায় ক্লান্ত বিরহের সমস্ত গ্লানি মোচন ক'রে দিচ্ছে। এই জলে ভেজা খাম বয়ে এনেছে যে লিপি, সেও কি এই বিলম্বিত মৌসুমেরই দূত?

চিঠিখানা খুলবার আগে প্রভাত নিজেকে এই ভাবালুতার মধ্যে ছেড়ে দিলো।

আমি মধ্যবিত্ত। শুধু বিত্তে নয়, চিত্তেও আমি মাঝারি। সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে চাই, কোন মোহে কোন ভ্রান্তিতে কোন বিকারে আমার এই বুদ্ধি যেন বিপর্যস্ত না হয়, লোপ না পায়। কিন্তু ভূমৈব সুখম্, আর পাঁচটা মানুষের মতো সে-স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম! অল্পে সুখ নেই অল্পে সুখ নেই! মাঝারিত্বের অল্প সীমা দীর্ণ ক'রে আমি বৃহতে উত্তীর্ণ হতে পারব, এ-আকাঙ্ক্ষা কি আমারও ছিলো না। কিন্তু দু-হাত আকাশের দিকে মেলে দিতে গিয়ে টের পেয়েছি আমি অভিশপ্ত, কী-এক নিয়তিনির্দিষ্ট দুর্জ্জেয় দুশ্ছেদ্য নাগপাশ বন্ধনে আমি জর্জরিত, বন্দী, আত্মঘাতী! হাঁ আত্মঘাতী, নিজেকে যে শ্রদ্ধা করতে পারবে না তার পক্ষে আত্মহনন ছাড়া আর কী বিকল্প আছে? তথাপি আমি নিজেকে মর্যাদাভ্রষ্ট হতে দিতে প্রস্তুত নই। নিজেকে শ্রদ্ধার আসন দিতে না পারলেও নিজেকে মর্যাদার আসন দিতে আমি বদ্ধপরিকর। অতএব মনের ভারসাম্য, সামঞ্জস্যবোধ এবং সাদাকে সাদাই দেখতে পাবার মতো চোখ আমাকে, যে ক'রেই হোক, বজায় রাখতেই হবে।

চিঠিটা পড়বার জন্যে প্রভাত বারান্দার অন্ধকার থেকে ঘরের মধ্যে আলোতে এলো। চিঠিতে ছিলো: "সুহৃদ্বরেষু, আগামী শনিবার তিনটে

থেকে চারটের মধ্যে সঙ্গীত-নিকেতনে আসবেন। আমি থাকব। দরকার আছে। ইতি নভসি।" ব্যস এত বড়ো নীলচে কাগজটিতে আর একটি কালির ফোঁটাও, অসাবধানেও প'ড়ে যায়নি! অবস্থা গুরুতর বোধ হচ্ছে। নভসির এই গাম্ভীর্যে প্রভাতের হেসে উঠতে ইচ্ছে হ'লো।

নভসিকে গাম্ভীর্য মানায় না, এই কথাটি প্রভাত মনে-মনে পুনরাবৃত্তি করলো। তার বদলে গুমোট বা গোমড়া ভাব ওর মুখে দিব্যি ফোটে। আচ্ছা, তোমার নামের অর্থ কী, নভসি? একদিন এই প্রশ্নের উত্তরে, জোড়া-ভুরু বাঁকিয়ে, চোখ তেরছা ক'রে মুখটি উড়ন-তুবড়ির মতো ক'রে কী ঝিকিয়েই উঠেছিলো মেয়েটা! 'কেন, অর্থহীন মনে হচ্ছে নাকি!'—ও বলেছিলো। 'না, অর্থে আগপাশতলা ঠাসা ব'লে মনে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হয়, অর্থগুলি এই বুঝি নামটাকে ফাটিয়ে চৌচির ক'রে দিয়ে নাকেমুখে এসে লাগবে—জখম হয়ে যাবার সম্ভাবনা'। যাঁহাতক এই অব্দি বলা, অমনি, নামটা না ফাটলে কী হবে, নভসি নিজেই ফেটে পড়েছিলো। ওঃ সেদিন সেই কী তোপের মুখেই পড়া গিয়েছিলো। কিন্তু হ্যাঁ, ঐ রূপেই ওকে একমাত্র মানানসই লাগে। কালবৈশাখীর ঝড় যখন দপ্ ক'রে ওঠে চোখেমুখে আচরণে তখনই ওকে সবচাইতে বেশী ভালো লাগে। এদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে, কাব্য ক'রে বলা চলে, ও বর্ষার মেয়ে নয়, ও গ্রীষ্মের। 'তোমার নামটি কে রেখেছিলো, নভসি?' আরেকদিন যখন জিগ্যেস করেছিলো সেদিন নভসির মেজাজ নরম ছিলো। 'আমাদের সমস্ত ভাইবোনের নাম যিনি রেখেছেন তাঁর কবিতা খুব সম্ভব আপনিও দুলে-দুলে মুখস্থ ক'রে তবে ম্যাট্রিক পাশ করতে পেরেছেন। তিনি হচ্ছেন আমার সেজমামা। আজ্ঞে হ্যাঁ, মা'র সহোদর ভ্রাতা।' অনেক সাধ্যসাধনার পর নভসি গর্বে মটমটিয়ে তার সেজোমামার নামটি প্রকাশ করেছিলো। এবং এ-কথাও জানিয়েছিলো যে তার নামটি সেজোমামা মেঘদূত থেকে নিয়েছেন। নভসি অবিশ্যি জানায়নি যে কালিদাস তার নাম এবং তার সেজোমামার নামকরণের জন্যেই শ্লোকটি রচনা করেছিলেন কিনা। নামটির উৎস-সন্ধানে শেষ পর্যন্ত মেঘদূত কিনেই ফেললাম। তবু ভালো যে ঐ উপলক্ষ্যে অত বিখ্যাত একটি রচনা সত্যিসত্যিই মোটামুটি প'ড়ে ফেলা গেছে। পরে একবার নভসির জন্মদিনে ওকে মেঘদূত উপহার দেওয়াতে ও কী খুশীই হয়েছিলো।

সঙ্গীত-নিকেতনের দোতলার ঝুল-বারান্দায় নভসি প্রভাতের অপেক্ষায়

দাঁড়িয়েছিলো। হাত তুলে প্রভাতকে ফটকের মুখেই দাঁড়াতে ব'লে সে চ'লে এলো। এবং ইঙ্গিতে তাকে সঙ্গ নিতে ব'লে রাস্তায় নেমে পড়লো।

কিছুক্ষণ নীরব পথচলার পর, প্রভাতের যখন মনে হ'লো যে এ যেন নির্বাক চলচ্চিত্রের কোন ভূমিকায় অভিনয়, যখন মনে হ'লো কাঁচপোকা আর তেলাপোকার কথা, যখন মনে হ'লো সে কথা না বললে নভসির কাছ থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে না—তখন সে স্বগতোক্তি করলো, 'হা ঈশ্বর! অমন এক নীল চিঠি পেয়ে ভাবলাম কী না জানি দরকারটা। নয়তো নভসির মতো মেয়ে চিঠি লিখবে! কিন্তু এখন দেখছি, দরকারটা হচ্ছে একজনের বাক্যধর্মঘটে সামিল হওয়া!'

সঙ্গে সঙ্গে নভসির মুখ থেকে একটি গোলা ফাটলে প্রভাত নিশ্চিন্ত হ'ত, কিন্তু প্রভাতকে অবাক ক'রে দিয়ে নভসি নিতান্ত নিরীহ গলায় বললো তাড়াতাড়ি, 'ঐ ট্যাক্সিটাকে থামতে বলুন। বলুন বলুন।'

প্রভাত হাত তুললো না। ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেলো। পরবর্তী আর একটাকে নভসি নিজেই থামালো। 'ইডন্ গার্ডেনে যেতে বলবেন। আসুন, রাস্তার মধ্যে যেন সীন ক্রিয়েট করবেন না'—ব'লেই নভসি ঢুকে পড়লো আগে। প্রভাত এ হুকুম তামিল করলো।

ট্যাক্সি ছুটছে। এখন বৃষ্টি না থাকলেও আকাশ সেই সকাল থেকেই ভারাক্রান্ত এবং দুপুর পর্যন্ত বেশ কয়েক পশলা হয়ে গিয়ে এখন কিছুটা হালকা। ট্যাক্সিতে ঢুকবার আগে পর্যন্ত প্রভাত চোখেমুখে কথাবার্তায় হালকা কৌতুকের এক ছদ্ম আবরণে নিজের মনের গভীরের চেহারা আড়াল ক'রে রাখতে পেরেছিলো, কিন্তু সেই আড়াল অতর্কিতে কোথায় উড়ে গেছে, নভসির বদখেয়ালের পাল্লায় প'ড়ে কী না জানি ঘটতে যাচ্ছে এই দুর্ভাবনায় তার মনের মধ্যে ছমছমিয়ে উঠেছে।

'এতদিন কী হয়েছিলো? এরকম ডুব দিয়ে থাকার মানে?'—নভসি আলাপ শুরু করলো।

প্রভাত দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে অপলকে নভসির দিকে তাকিয়ে রইলো নিরুত্তরে।

'চুপ ক'রে আছেন যে?'

'কিছু মনে পড়ছে না।'

'কী মনে পড়ছে না?'

'কোন জুৎসই সংলাপ।'

'তার মানে ?'

'তার মানে এমন কোন বুলি যা শুনলে সিনেমা-থিয়েটরের হুজুগওয়ালারা তারিফ করবে আর হাততালি দেবে।'

'আমাকে কি আপনি তাদেরই একজন ঠাওরালেন ?'

'আরে ছোঃ তুমি তা হতে যাবে কেন। তুমি তো নায়িকা।'

'আর তুমি ?'

ট্যাক্সিটাই কি উলটে গেলো প্রভাতের বুকের মধ্যে ? তা যাক কি না যাক, তার সমূহ চৈতন্য আর কিছু না পেয়ে হৃৎপিণ্ডটার ওপরই ঢাক বাজাতে লাগলো, মূলাধারপদ্মে কুলকুণ্ডলিনী জেগে গেলো। নভসির চোখের তারা যেন তখন দপদপিয়ে নাচছে, রঙ বদলাচ্ছে, কী তার তীব্র ঝলক ! প্রভাত সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হ'লো।

একটু আত্মস্থ হয়ে নিয়ে প্রভাত জবাব দিলো, 'আমি কী, সেটাও ভাবছি। তবে তুমি এটা যা বললে না, একেবারে হিট্ ! বক্স-অফিস লুটপাট হয়ে যাবে।'

'এত কমপ্লেক্স কেন মনের মধ্যে ! কোন জিনিসই কি সাদা সরল মনে নিতে জানেন না ?'—চরম উত্তেজনায় নভসির গলা ভেঙে পড়লো। অভিমানে অপমানে টস্‌টস্ করতে লাগলো সারা মুখখানা। এত বড়ো আঘাত প্রভাত তাকে দিতে পারবে এ যেন সে কল্পনাও করেনি। বাইরে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এরপর সে ব'সে রইলো চুপচাপ।

নিজের অজান্তেই প্রভাত মনের মধ্যে হিংস্র হয়ে উঠেছিলো। তার মনে হচ্ছিলো তাকে নিয়ে নভসির আজ এ এক অভিনব বিলাস, অভিনব খেলা। সে-খেলায় রোমাঞ্চ আছে ব'লেই কি ওর ধারণা যে তাতে আমি আহ্লাদে ডগমগ হব ? রোমাঞ্চকর খেলা কি আমিও তুটো একটা জানি না ! এবং সে-খেলা খেলতে আমারও তো সাধ জাগে !

তুজনের মাঝখানে শারীরিক ব্যবধান ছিলো। প্রভাত ঘড়ি দেখবার অছিলায় নভসির বাঁ হাতটি টেনে নিলো। নভসি ঝটকা মেরে হাত কেড়ে নিলো। 'ও কী, ক'টা বাজে দেখছিলাম !'—ব'লে প্রভাত ওর কোলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হাতটি টেনে বের করবার জন্যে, পাঞ্জাবী ড্রাইভারটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে, শালীনতা অতিক্রম করলো।

এবং এই প্রথম। নভসির প্রতি আচরণে প্রভাতের এমনি মাত্রাহীনতা এই প্রথম। প্রভাতের এই আচম্বিত রভস-উৎসারণে, নভসির তু-চোখের রঙীন পেয়ালায় মরণাসক্ত ফেনিল সুধা চরম আবেগে উচ্ছ্রিত হ'লো।

পাঞ্জাবী ড্রাইভারটির অভিজ্ঞতায় এমনি পরিস্থিতির মধ্যে অভিনবত্ব ছিলো কিনা কে জানে! কিন্তু তার গাড়ীর স্পিডোমিটারের কাঁটা ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা উত্তেজিত হ'লো।

কিন্তু প্রভাতের কাণ্ডজ্ঞান এত ভীরু! কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই সে প্রত্যাহার করলো। মনের মধ্যে যে আত্মচেতনার সাপগুলো এতক্ষণ নিঃসাড়ে ছিলো তাদের লেজে পা পড়তেই তারা খেপে গিয়ে বিবেককে মারাত্মকভাবে দংশন করলো। কিন্তু এই কাণ্ড ঘটানোর পরে আবার স'রে বসা অর্থাৎ নভসির সঙ্গে শারীরিক ব্যবধান রচনা করা হয়তো আরও অশ্লীল হবে এই ভয়ে প্রভাত প্রেতস্তব্ধ চেতনায় হতবুদ্ধি হয়ে রইলো।

নভসি আসনের পিঠে এলিয়ে মুদিতচক্ষে অসাড়ে প'ড়ে থাকলো।

ইডেন গার্ডেনের ফটকে গাড়ী না থেমে, প্রভাতের নির্দেশে গঙ্গার পাড়ে চললো। গোয়ালিয়র মনুমেন্টের কাছে এসে প্রভাত গাড়ী ছেড়ে দিলো। নভসি তাড়াতাড়ি টাকা বের ক'রে দিলো। 'আমার তাগিদে এসেছেন টাকা আমি দেব'—নভসি এই যুক্তি দেখালো।

'আপনার তো কোন তাগিদ ছিলো না'—নভসি আবার বললো প্রভাতের মধ্যে নির্বন্ত আগুন উসকে দিচ্ছে এমনিভাবে।

কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে নভসি বাঁকা চোখে তাকালো প্রভাতের মুখের দিকে। কিন্তু তার ভাবগতিক ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। প্রভাতের মুখের এই চেহারার সঙ্গে তার কোন পরিচয়ই নেই এমন নয়, কিন্তু এখন, এই পরিপ্রেক্ষিতে, ঐ মুখের কি অন্য কোন অর্থ থাকবে না? কেন ও আমার সঙ্গে এমন করে? লোকটা এত নিষ্ঠুর কেন?

'চলো একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসি'—প্রভাত বললো।

পাথরে বাঁধানো গঙ্গার পাড়। লোকের বিশ্রাম বিনোদনের জন্যে বেঞ্চি পাতা আছে কয়েকটি। লোকসমাগম এখনও খুব বেশি হয়নি। দুটো বেঞ্চি একেবারেই ফাঁকা রয়েছে। প্রভাত দুটোর কোন্‌টা ভালো হবে চিন্তা করছিলো, নভসি তার অপেক্ষায় না থেকে হনহনিয়ে গিয়ে একেবারে কোণের দিকেরটায় ব'সে পড়লো।

প্রভাত ধীরেসুস্থে গিয়ে নভসির পাশে বসলো।

বেশ খানিকটা সময় এতই চুপচাপ কেটে গেলো যেন দুজনের কেউই নিশ্বাস নিচ্ছে কিনা সন্দেহ করতে হবে! এবং নীরবতাই শেষ পর্যন্ত পাছে গলা টিপে ধরে এই ভয়েই হয়তো প্রভাত বললো, 'একেবারে নীরব যে? ঝগড়া শুরু করো।'

'এক হাতে কি তালি বাজে ?'—নভসির গলা তরল ধাতব গাঢ় শোনালো।

কথাটা যেন প্রভাত শুনতেই পেলে না। আসলে সে গাড়ীর ভেতরে তার সেই উদ্ভট আচরণের গ্লানি তখনো কাটিয়ে উঠতে পারছিলো না। তার বিরাট আত্মগরিমা এক অতর্কিত অসংযমে, পদস্খলনে একেবারে ধূলিসাৎ হয়েছে—এই লজ্জায় যেন তার মাথাকাটা যাচ্ছিলো এমনি মুখ ক'রে সে ব'সে রইলো।

নভসি বিষয়টা অনুমান করতে পারেনি এমন নয়; কিন্তু এ অনুমান মিথ্যে, নিজেকে সে তাই বোঝাতে চাচ্ছিলো। ঘড়ি দেখার ছুতো ক'রে অন্য লোকের সামনেই ও একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে তা ঠিকই, কিন্তু তাতে হয়েছেটা কী! কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে তাতে যে লোকটা সেই থেকে মুখটা একেবারে পেঁচার মতো ক'রে রেখে জড় কবন্ধ হয়ে রয়েছে! এ-সবের মানে কী। হাওয়াটা হালকা ক'রে তুলবার চেষ্টায় সে প্রভাতকে মৃদু একটি চিমটি কেটে চোখ-ইশারায় পাশের বেঞ্চিতে বসা লোকটির দিকে প্রভাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। লোকটি নীল চিঠিতে মগ্ন, একেবারে তলিয়ে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, চার পাঁচখানা নীল পৃষ্ঠা লোকটির হাতের মধ্যে, তৃপ্তিতে আরামে তার সমস্ত মুখখানা ডগমগ, বিভোর!

মৃদু হেসে প্রভাত মুখ ফেরালো।

চীনেবাদাম, মুড়ি, মালিশ, জুতো পালিশ ইত্যাদি একের পর এক এসে জ্বালাতন শুরু করলো। নভসি সবাইকে হাঁকিয়ে দিতে লাগলো। শুধু চীনেবাদামওয়ালাকে একটু পরে ফের আসতে ব'লে দিলো।

বেঞ্চিটার ঠিক পেছনেই একটা পাকুড় গাছ, মাথার দিকে সে খুব একটা বাড়েনি, ডালপালা ছড়িয়ে বেঞ্চিটার মাথার ওপর দিয়ে এগিয়ে যেন সে নদীর বুকে নিজের ছায়া দেখছে, দেখছেই। এবং সেই ছড়ানো ডালপালায় গুটিকয়েক বাচ্চা হিন্দুস্থানী ছেলে হুটোপুটি করছিলো। তরতর ক'রে তারা গাছটার ওপর উঠে যাচ্ছে, নেমে আসছে, এ-ওর গায়ে ঢিল ছুঁড়ছে থুথু দিচ্ছে চিৎকার করছে, একটিতে আবার একটা মোটা ডালের ওপর চেপে ব'সে সদ্য-উদ্গত কচি একটা ডালকে মুঠো ক'রে ধ'রে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করছে: খেরবেট খেরবেট খেরবেট গ্যাঁগ্যাঁগ্যাঁগ্যাঁ!

কী রে বাবা, জাহাজ চালাচ্ছে নাকি ছেলেটা! সারেং! প্রভাত খানিকটা হালকা বোধ করলো এই সব লক্ষ্য ক'রে। বললো, 'নাঃ এই শাখামৃগগুলোর দৌরাত্ম্যে এখানে বসা যাবে না দেখছি। চলো ঐ বেঞ্চিটায় যাই। এসো এসো একটু পরে আর ফাঁকা পাওয়া যাবে না'—বলেই প্রভাত উঠে পড়লো।

এই বেঞ্চিবদলে নভসি কিছু পরে বোধ করলো, যেন-বা আবহাওয়ার কিছু বদল ঘটেছে, বুঝি-বা লোকটার মনের স্বাস্থ্যের খানিক উন্নতি ঘটেছে! কারণ ওর মুখের রঙ চোখের ঢঙ ক্রমশই যেন এতক্ষণে স্বাভাবিক হব-হব করছে, বচনের মধ্যে যদিও এখনও তেড়া-ভাবটা কাটেনি।

নভসি বললো, 'আপনার মুখের ডান দিকটা একরকম আর বাঁ দিকটা অন্য রকম! কী অদ্ভুত! আপনি মানুষটা যেমন অদ্ভুত তেমনি। ডানদিকটা দেখলে মনে হয় লোকটার রসকস বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে না আছে তা নয়, কিন্তু বাঁ দিকটা কেমন বোকা-বোকা। ইচ্ছে করে—'

'থামলে কেন? ব'লে যাও!'

'না থাক, আর বললে হয়তো শেষকালে রাগের চোটে আমাকে ঠেলা মেরে ফেলেই দিলেন জলের মধ্যে। কিছুই তো বিচিত্র নয় আপনার পক্ষে!'

রেলিঙের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে প্রভাত বেশ আয়েশ ক'রে বসলো। চশমাটা খুলে নিয়ে বললো, 'একটু পরিষ্কার ক'রে দাও তো।'

'কী পরিষ্কার করব?'

'চশমার কাঁচ।'

'কী দিয়ে?'

'কাপড় দিয়ে।'

'অহহহ! আপনার কাপড় নেই?'

'ময়লা হয়ে গেছে দেখছ না? তোমার শাড়ীটা বেশ ধবধবে আছে।'

'এত ময়লা কাপড় পরেন কেন? ভারী নোংরা স্বভাব।'

'আমার সব কিছুই নোংরা।'

'বেশী তেড়া তেড়া বাত বললে ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি।'

শাড়ীর আঁচলা দিয়ে নভসি বেশ যত্ন ক'রেই চশমার কাঁচ মোছা শেষ করলো। এবং তারপর ফ্রেমটির দিকে নজর পড়তেই গজর গজর শুরু করলো, 'কী ক'রে রেখেছেন দেখুন তো! একটু হুঁশ নেই! ম্যাগ্‌গোঃ, কী রে লোকটা!'—ব'লে সে রুমাল দিয়ে ফ্রেমটির মালিন্য ঘোচাতে মন দিলো। সেটা হয়ে গেলো তো নজর পড়লো প্রভাতের ফাউন্টেন-পেনটির ওপর। বুক-পকেটে গোঁজা কলমের ক্লিপটি বিবর্ণ হয়ে গেছে। ছোঁ মেরে নর্ভসি তুলে নিলো কলমটা। কলমটা দামী এবং নভসিরই দেওয়া উপহার। বছর তিনেক আগে নভসির খুড়তুত ভাই অমরের বন্ধু হিসাবে প্রভাতের সঙ্গে তার পরিচয়। নভসি তখন গান শিখত কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষ জানত না, আসন্ন রবীন্দ্রজয়ন্তী

উপলক্ষে দু-চার জায়গা থেকে গান গাইবার আমন্ত্রণ আসছিলো, নভসির তাইতে শখ হয়েছিলো রাতারাতি কয়েকটি গান তুলে নেবার, অমরকে সে-কথা বলতেই সে সঙ্গে সঙ্গে এনে হাজির করেছিলো প্রভাতকে। প্রভাত তাকে বেশ কয়েকটা গান শিখিয়ে দিলো। নভসি উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে চেয়েছিলো কিন্তু প্রভাত নেয়নি। তখন সে এই কলমটি উপহার দিয়েছিলো। সেই কলম প্রভাত এখনো হারায়নি নষ্ট করেনি ফেলে দেয়নি—ভাবতে ভাবতে নভসি কলমের ক্লিপটার নিবে যে ময়লা জমেছে তা তুলবার জন্যে খোঁপা থেকে একটা কাঁটা টেনে নিলো।

খাদ্যসন্ধানী কয়েকটা কাক জলের ওপর হন্যে হয়ে ফিরছে। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে এখানে-ওখানে ভাসমান বয়ার মাথায়। একটিমাত্র কাক, না কি ওটা চিল, দূর শূন্যে সঞ্চরমাণ, যেন সব সমস্যার থেকে সে মুক্ত। সমস্ত আকাশটাই মেঘে মেঘে ঠাসা। পুবালি জোলো বাতাস জানান দিচ্ছে যে-কোন মুহূর্তেই বৃষ্টি নেমে যেতে পারে। জলের বুকে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ উঠছে, কী ভারী জল, জলহস্তীর গায়ের মতো ঘোলা রঙ, তাকালে মনে হয় যেন আবেগে মথিত হচ্ছে। মধ্যগঙ্গায় নিথর ফ্ল্যাট। বিশাল বিশাল কয়েকটা জাহাজ অবিশ্বাস্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের উঁচু মাস্তুল আর নিশানগুলো আত্মগরিমায় যেন মটমট করছে প্রভাতের মনে হ'লো। মোটর-লঞ্চ আর ছোট ছোট স্টিমার আসছে যাচ্ছে আর যেন বলছে আমরা বড়ো ব্যস্ত আমরা বড়ো ব্যস্ত! মালটানা কয়েকটা ঢাউস কিস্তি নোঙর করা। পালতোলা একটা ভড় মধ্যগঙ্গায় দুলছে। আর এইসব নিয়ে আমি ব'সে আছি জড়ভরতের মতো। আমার পাশে ব'সে রয়েছে যে-মেয়েটি তার চোখে প্রকট হয়ে রয়েছে, কবিতার ভাষায়, মদিরেক্ষণ মায়া! মনে হচ্ছে এই শিথিল প্রহরে জগৎসংসারের যাবতীয় নিয়মনীতি অনুশাসন সব-কিছু শিথিল, অর্থহীন, বিবর্ণ হয়ে গেছে। আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর! কিন্তু হৃদয়ে আমার চড়া! চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে, কোথায় পুরুষকার? সে যে পলাতক, সে ভীরু! শ্লথনীবি যৌবনভারনত এই মেয়েটি স্পষ্টতই নদীর ঐ ঘোলাজলের মতোই ফুলে-ফুলে উঠছে আবেগে, আশ্লেষ কামনায়, প্রেতসঞ্চরিত পিপাসায়! কলমটা মুঠির মধ্যে ধ'রে সে নখ খুঁটছে পায়ের। ঐ চিত্রল নখেও সহজিয়া রঙ! কী ঐ আনত দৃষ্টির মানে? থমথম করছে আকাশ, সমস্ত চরাচর, হৃদয়। একেই কি বলা যায় অনশ্বর মুহূর্ত? কী অঙ্গীকার ও চায় আমার কাছে?

এক লোলচর্ম কুৎসিতদর্শন বুড়ী এসে হাত পেতে দাঁড়ালো প্রভাতের

সামনে। বুড়ীর দিকে তাকিয়ে তার গা শিরশিরিয়ে উঠলো। প্রভাতের দেরী দেখে বুড়ী নভসির দিকে হাত বাড়ালো। নভসির পায়ে হাত দেবার চেষ্টা করলো। নভসি আঁতকে ওঠে। প্রভাত তাড়াতাড়ি একটা আনি ফেলে দিলো বুড়ীটার হাতে। বুড়ী সেলাম বাজিয়ে থুরথুরিয়ে স'রে গেলো।

নভসির চোখে চোখ রাখতে প্রভাতের সাহসে কুলোচ্ছিলো না। কয়েকটা গাধাবোট পাশাপাশি নোঙর করা রয়েছে সেইদিক থেকে যেন দৃষ্টি ফেরানো অসম্ভব এমনি স্থিরনিবদ্ধ চোখে প্রভাত অমনি গাধাবোটেরই মতো জড় হয়ে ছিলো।

'মরমে ম'রে যাচ্ছেন নাকি!'

'কেন?'—ব'লে প্রভাত গাধাবোট থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহার ক'রে একটি ধাবমান লঞ্চের পেছনে ছেড়ে দিলো।

'চলুন ওঠা যাক!'

নভসির কথার স্বরে প্রভাতের চমক লাগলো। কিন্তু অসম্ভব অসম্ভব! এ স্বীকার ক'রে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বললো, 'কী দরকারে চিঠি লিখেছিলে তা কিন্তু এখনো বলোনি।'

'দরকার মিটে গেছে, আমি ভুল করেছিলাম!'

'তুমি প্রায়ই ভূমিত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে চাও'—প্রভাত বিনা ভূমিকায় আচমকা শুরু করলো, 'চলো না আজকেই আলাপ করিয়ে দিই?'

সঙ্গে সঙ্গে নভসি উঠে প'ড়ে বললো, 'ও আমি খুব দুঃখিত, আমার একদম খেয়াল ছিলো না, কিছু মনে করবেন না দয়া ক'রে। যান আপনি চ'লে যান, আপনার সময় হয়ে গেছে। আমি একাই ফিরতে পারব।'—ব'লেই নভসি চলতে শুরু করলো দ্রুত।

প্রভাত হকচকিয়ে গেছে। নভসির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার পাশে-পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে বললো, 'কী পাগলামি করছ! নভসি, কী ছেলেমানষি হচ্ছে বলো তো—'

'প্রভাতবাবু, আপনাকে আমি অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে জানবেন।'

'বড়ো বেশী নাটক ক'রে ফেলছ নভসি।'—প্রভাতও হিংস্র হয়ে উঠলো।

'নাকি? তা সেই নাটক থেকে আপনি এবার বিদায় নিলেই আমি বাঁচি। যথেষ্ট হয়েছে, আর না!'

নভসির মুখে এমন কর্কশ, কুৎসিত, কালো রেখা প্রভাত এর আগে কখনো

দেখেনি। অমন অপরূপ লাবণ্যময়ী মুখ যে এমন কুটিল নির্বোধ নিষ্প্রাণ হয়ে উঠতে পারে তা প্রভাতের কাছে অবিশ্বাস্য ছিলো।

ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

'এই রিক্সা'—প্রভাত ডাক দিলো।

'দাঁড়াও'—ধমকের স্বরে প্রভাত আদেশ করলো নভসিকে।

নভসি গ্রাহ্য করলো না।

ওকে থামাতে প্রভাত অগত্যা ওর হাত টেনে ধরলো শক্ত ক'রে।

'কী হচ্ছে রাস্তার লোকজনের মধ্যে। কোন ভয় নেই তোমার, আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। বৃষ্টি পড়ছে, দয়া ক'রে রিক্সায় ওঠো।'—ব'লে প্রভাত নভসিকে একরকম টানতে-টানতেই রিক্সার কাছে নিয়ে গেলো।

'আশা করি রিক্সায় উঠে আপনি আপনার এই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাবেন না'—ব'লে নভসি রিক্সায় উঠে বসলো।

প্রভাত উঠে বসলো পাশে।

বৃষ্টি থেকে আরোহীদের বাঁচানোর জন্যে রিক্সাওলা রিক্সার চারদিকে পর্দা ঝুলিয়ে দিলো। এবং তারপর রিক্সাওলা সেই জনবিরল রাস্তায় ছুটতে লাগলো।

কিন্তু ওরা স্থির হয়ে রইলো। মৃতের মতো স্থির!

উত্তেজনার অসহনীয় ধাক্কায় নভসি একেবারে ঠাণ্ডা, পাথর হয়ে গেছে। প্রভাতের স্পর্শ যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে, নিজেকে সাধ্যমতো সঙ্কুচিত ক'রে, নভসি মুদিতচক্ষে রিক্সার কাঠে মাথা ঠেকিয়ে ব'সে আছে।

প্রভাত দেখছিলো। নভসির এই অতর্কিত মেজাজে সে স্তম্ভিত। অথচ পরিস্থিতিটা তার কাছে নিতান্ত অবাস্তব, হাস্যকর, নির্বুদ্ধিতার চরম ব'লে ঠেকছিলো। হাস্যকর, কিন্তু হেসে ওঠা সম্ভব নয়। অসম্ভব? এই প্রশ্নটি খতিয়ে দেখবার জন্যে যে-সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের প্রয়োজন, প্রভাত আশঙ্কা করলো, সেটুকু তার মস্তিষ্ক থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে লোপ পেয়েছে। বুদ্ধিহীনতার গর্তে নভসি যেন তাকে ঠেলে দিয়েছে। অসহায়ের মতো সে যেন এক কালো, নীরন্ধ্র, বিষাক্ত অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

'নভসি!' প্রভাত আচ্ছন্নভাবে তোয়াজের স্বরে ডাকলো অস্ফুটে।

বৃষ্টি বেড়েছে। রিক্সার গতি আনুপাতিকভাবে কম। নভসি নিশ্চল বরফের চাপের মতো স্থির।

'নভসি!'—প্রভাত আবার উচ্চারণ করলো।

রিক্সাওলা কোন্ দিকে যেতে হবে জিগ্যেস করছে।

প্রভাত কী বলবে বুঝতে পারছিলো না।

নভসি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেই বললো আচমকা, 'ধর্মতলা মোড়। বাস স্ট্যাণ্ডে চলো। জল্‌দি।'

এই সামান্য ব্যাপারে নভসির গলা এত কর্কশ হয়ে গেলো! প্রভাত হাল ছেড়ে দিলো।

'নভসি!'—প্রভাত আরো একবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু বৃথা।

প্রভাত দেখলো নভসির বাঁ-হাতখানা রয়েছে হাঁটুর ওপর। কী সুন্দর ওর আঙুলগুলি। অনামিকায় পোখরাজ, বর্ণহীন। ঐ আঙুলে সবই মানায়। মণিবন্ধে ঘড়িটিও কী সুন্দর, যেন রাজার ঐশ্বর্য। নখগুলি ম্যানিকিওর করা। ওর পায়ের নখগুলিও প্রভাত নজর ক'রে দেখলো। এত সুন্দর! এত সৌন্দর্য প্রভাতকে প্রহার করে। নিষ্ঠুর আগুনের গর্ভে অন্ধ তাড়নায় আকৃষ্ট একটা পোকার মতো নিজেকে মনে হয়। ঐ পায়ে সমস্ত ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ লুটিয়ে যেতে চায়, পশুর মতো চুম্বনের স্পৃহা জাগে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবেক থুথু ছিটিয়ে দেয়! মনের মধ্যে অভ্রভেদী হয়ে আছে যে অহংএর ধারাল পাহাড় তার গর্ভে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে।

'নভসি'—আবিষ্ট গলায় প্রভাত এবার যেন এক পাকা অভিনেতার উৎকৃষ্টতম অভিনয়কলা নিজের মধ্যে আরোপ ক'রে দিতে পেরেছে ব'লে কল্পনা করলো এবং এটা যেন অভিনয়ই হচ্ছে এমনি আবেশ-বিবশ চেতনায় সে নভসির বাঁ হাতটি টেনে নিলো দু-হাতে।

নভসি ভয়ানকভাবে চমকে উঠেছে। হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্যে সে ঝট্‌কা মারলো। কিন্তু প্রভাত শক্ত ক'রেই ধরেছিলো, সে যেন সেই আগুনের পিণ্ডটা পিষতে পিষতে নিজের দু-হাত পোড়াতে লাগলো।

'ছাড়ুন। ছেড়ে দিন বলছি।'

নভসির দু-চোখ ঘৃণায় প্রমত্ত হয়ে উঠেছে।

'যে লোক কথার খেলাপ করে তাকেই তো লোকে বেইমান বলে?'—খরধার দৃষ্টিতে নভসি প্রশ্ন করলো।

এবং এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের মুখের চেহারা যে ছাইয়ের মতো মলিন হয়ে গেলো এই দেখে নভসির মনের মধ্যে একটা উগ্র কেউটে ফণা তুলে দুলতে লাগলো।

হাত ছেড়ে দিয়ে প্রভাত পর্দা সরিয়ে রাস্তা দেখলো। বৃষ্টি ধ'রে এসেছে।

বাসস্ট্যাণ্ড এসে গেছে। রিক্সাওলাকে প্রভাত স্ট্যাণ্ডের ছাউনির বগলে নামিয়ে দিতে বললো।

রিক্সা থেকে নেমে প্রভাত টাকা বের করতে যাচ্ছিলো।

'না থাক প্রভাতবাবু'—উদ্ধত কটু গলায় নভসি কথাটা ব'লেই, চটপট একটা দু-টাকার নোট রিক্সাওলার হাতে দিয়ে ওকে বিদায় ক'রে দিলো।

সেলাম ঠুকে রিক্সাওলা অপসৃত হ'লো।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা তিন নম্বর বাস এসে দাঁড়াতেই নভসি পড়ি-কি-মরি ক'রে সেই বাসের মধ্যে উঠে পড়লো।

প্রভাত স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়েই রইলো স্ট্যাণ্ডে।

শিবেন ইতিমধ্যেই বারকয়েক পাখার বাড়ি খেয়েছে। ফের টিপ্পনী কাটতেই ভূমিত্রী দেয়ালের ঝুল-ঝাড়ার ঝাড়নের বাঁটটা দিয়েই শিবেনের ব্রহ্মতালুতে ঠকাস ক'রে এক ঘা লাগিয়ে চোখ পাকিয়ে শাসালো, 'ফের ?'

শিবেন আতঙ্কিত হবার চেষ্টা করলো কিন্তু তার মুখে হাসি বেরিয়ে পড়লো। 'নেমন্তন্ন খেতে এসে তো খুব খাওয়া খাচ্ছি তখন থেকে'—দারুণ অনুযোগের সুরে সে কথাটা বলতে চাইলো, কিন্তু শোনালো পরম তৃপ্তির সুর।

'কোথায় দিদির কাজে একটু সাহায্য করবে তা না ব'সে-ব'সে বাবুর ফুট কাটা হচ্ছে। ফাজিল কোথাকার।'—দেয়ালের ঝুল পরিষ্কার করতে করতে ভূমিত্রী বললো।

'দিদির কাজে সাহায্য করা মানে তো একদম চুপটি মেরে ব'সে থাকা ? তোমারি কাজে অন্য কেউ হাত লাগালে তো তোমার কাজ বাড়ে শুনতে পাই ? তাই না ? এই রে ! আর রা নেই ! ওকী, চোখে ময়লা পড়লো বুঝি ? কী মুশকিল—'

শিবেন অস্থির হয়ে পড়লো।

ভূমিত্রী খাটে এসে ব'সে বললো, 'নাঃ বের করতে পারছি না তো ? তুমি একটু ছাখো না ভাই।'

শিবেন ত্রস্তে জানালার পর্দাটা তুলে দিলো যাতে বেশী আলো পাওয়া যায়। তারপর পরম যত্নে ভূমিত্রীর চোখের পাতা টেনে ধ'রে ময়লা খুঁজতে লাগলো।

'কৈ গো'—শিবেন সন্দিগ্ধ গলায় বললো, 'চোখে হাতী-ঘোড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে তো ?'

ভূমিত্রী সঙ্গে সঙ্গে রাগ দেখিয়ে উঠে পড়লো। চ'লে গেলো বাথরুমে।

খানিক পরে গায়ত্রী ঘরে ঢুকলো, তার এক হাতে রেকাবিতে কাটা আম এবং অন্য হাতে জল।

শিবেন টের পায়নি, সে টেবিল থেকে একটা মাসিকপত্র টেনে নিয়ে ওলটাচ্ছিলো।

'ও কী রাঙাদা, একা-একা হাসছো যে ?'—গায়ত্রী অবাক।

এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবেনের চমক দেখে গায়ত্রীর চোখ আরো গোল হ'লো।

'দিদিকে বলছি দাঁড়াও তোমার রাঁচীর টিকিট দরকার।'

'তাই নাকি ?'—ভূমিত্রী ঘরে ঢুকে বললো। চোখেমুখে সে জলের ঝাপটা দিয়ে এসেছে, গামছা টেনে নিয়ে মুখ মুছতে লাগলো।

শিবেনের শীর্ণ গৌরবর্ণ মুখখানিতে লজ্জার রঙ প্রকট হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ দিদি, রাঙাদা না, একা-একা হাসতে আছিলো।'

'অ্যাঁ!'—ভূমিত্রী কৌতুকে ফেটে পড়লো।

কিন্তু শিবেনের মুখের শোচনীয় অবস্থা দেখে ভূমিত্রী আর ঘাঁটালো না। গায়ত্রীকে ব'কে উঠে বললো, 'আম দিলি চাইমচা গ্যাস নাই ক্যান? বুদ্ধিশুদ্ধি আর কবে হইবে তোর।'

গায়ত্রী ছুটে চ'লে গেলো এবং মুহূর্তের মধ্যে একটা চামচে এনে আমের ডিসে রেখে লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে পালিয়ে গেলো।

আমে মাছি বসছিলো, ভূমিত্রী পাখা দিয়ে তাড়িয়ে বললো, 'নাও এটা খেয়ে নাও তো চটপট। আম খাবেন উনি আর আমি ব'সে ব'সে মাছি তাড়াই!'

'দিদিদের তো ঐ কাজ।'

'মরি মরি! আহ্লাদে বাঁচেন না! আইবুড়ো ছেলের শখ কম নয়।'

'আচ্ছা তুমি কথায় কথায় আমাকে আইবুড়ো ব'লে গাল দাও কেন ?'

'তুমি একটা আস্ত আইবুড়ো ব'লে।'

'আর তুমি নিজে কী ?'

'এই কচু খেয়েছে! আমার তো টিকলো না তাই। আমার কি আর তোমার দশা!'

'কার দশাটা বেশী খারাপ ?'—শিবেন ভয়ানক অবাক হয়ে গিয়ে বললো।

শিবেনের সরল কিশোরসুলভ মুখখানার অবস্থা দেখে ভূমিত্রীর চোখে-মুখে কৌতুক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

'নাও বাবা তোমার সঙ্গে আমি আর ঝগড়া করতে পারি না। উঃ কী মাছি হয়েছে কয়েকদিন থেকে আর পারি না। খেয়ে নিতে বলছি না ?'

'তুমি যা করছিলে তাই করোগে না।'

ভূমিত্রীর চোখের কোণে হাসি ঝিকিয়ে উঠলো গালে টোল পড়লো। বললো, 'ও তুমি তো আবার তাকিয়ে থাকলে খাবে না! লজ্জাবতী লতা! তুমি এমন মেয়েদের মতো হয়েছো কেন!'

'মেয়েদের মতো? মেয়েরা তো আজকাল সকলের সামনেই গপগপ ক'রে খায়।'

'একেলে মেয়েদের মতো হ'লে তোমার তো একটা গতিই হয়ে যেত। আমি তা বলিনি। আমি বলছি তুমি সেই নোলক-পরা সাত হাত ঘোমটা-টানা সেকেলেদের মতো হয়েছো কেন।'

'ছুটির দিন ব'লে বাড়িতে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে এনে মারধর করছো গালাগাল দিচ্ছো তখন থেকে, এ তো আচ্ছা ভদ্রতা!'

ভূমিত্রী শিবেনের চুলের ঝুঁটি ধ'রে একটা টান দিয়ে বললো, 'এর নাম বরিশালী ভদ্রতা।'

'ভাগ্যিস পাকিস্তান হয়েছে নয়তো তোমাদের যে কী হত!'

'পাকিস্তান না হ'লে তোমার নিজের কী হত সেটা ভাবছো না!'

'আমার আবার কী লোকসান হত?'

'আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হত না। আমার সংস্পর্শে না আসার ফলে তোমার মানুষ হবার কোন আশাই থাকত না।'

'তাই কি? আমি তো মানুষ ছিলামই। তোমার সংস্পর্শের ঠেলায় শুনতে পাচ্ছি নাকি সেকেলে মেয়েমানুষ হয়েছি!'

আমের এক টুকরো শিবেনের মুখের মধ্যে ঠেসে দিয়ে ভূমিত্রী উঠে পড়লো।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ভূমিত্রীর ঘরে তাসের আসর বসেছে। ব্রে খেলা, পাঁচ জনে খেলছে। শিবেন, ভূমিত্রী, ভূমিত্রীর মা মহামায়া, ভূমিত্রীদের বাড়ির দোতলার বাসিন্দা বাড়িওয়ালার গিন্নী স্থলতা এবং ভূমিত্রীর বৌদি স্বপ্তি।

শিবেন তাস চিনত না। কোন্‌টা হরতন কোন্‌টা চিড়িতন তাও জানত না। কিন্তু ভূমিত্রীর পাল্লায় প'ড়ে শিখতে হয়েছে। তাসের দিকে তাকিয়ে শিবেনের হাই উঠত, ঘুম পেত। কিন্তু ভূমিত্রী যাকে বলে ঘাড়ে ধ'রে শেখানো তেমনি ক'রেই শিবেনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছে। শিবেনের অবস্থা এবং ভূমিত্রীর অধ্যবসায় দেখে ভূমিত্রীর বাড়ির সবাই পরম কৌতুক বোধ করেছে।

কিন্তু খেলার কায়দাকানুন তবুও শিবেনের সেরকম রপ্ত হয়নি।

ফলে ভূমিত্রীর দাদা পরমেশকে বসতে হয়েছে শিবেনের পেছনে। শিবেনকে ঠিকমতো খেলাতে।

কারণ তাসে ভুল খেলা স্থলতা বরদাস্ত করতে পারেন না। বাড়িভাড়া

ঠিকমত দিতে ভুল করলে সুখলতা তত চটেন না যত চটেন তাসে ঠিকমতো খেলতে ভুল করলে। ব্রে-খেলার জন্যে তাঁর একখানা মোটা বাঁধানো খাতা আছে। তাতে নম্বর লেখা হয়। মলাট দেওয়া খাতা। মলাটের ওপর লেখা : ব্রে-র খাতা ; তার নিচে মাঝামাঝি জায়গায় : সুখলতা দেবী ; তার নিচে মলাটের পাদদেশে : ৪৯এ, নেবুতলা রো, কলিকাতা। সুখলতার কনিষ্ঠ পুত্রের হাতের লেখা মুক্তোর মতো ব'লে সুখলতা এ-সব তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। মলাটটা ময়লা হয়ে গেলে খাতায় নতুন মলাট ওঠে, সুখলতার কনিষ্ঠ পুত্রকে লেখাগুলো আবার লিখতে হয়। কারণ এ-খাতা তো ফেলে দেওয়া যাবে না, এতে যে গত তেরো বছরের ব্রে-খেলার হিসেব আছে। কোথাও খেলতে যেতে হলে মেদের পাহাড় সুখলতা বগলে এই খাতাখানি এবং হাতে পানের বাটা নিয়ে থপথপিয়ে অগ্রসর হন।

শিবেনের এ-সব জানা ছিলো। তাই আতঙ্কে সে খেলতে বসতে চায়নি। কিন্তু ভূমিত্রী ছাড়বে না। ফলে ত্রাণকর্তা হিসেবে পরমেশ এসে বসেছে তার পেছনে।

আসলে পরমেশই খেলছে, তাসগুলো শুধু ধ'রে থাকছে শিবেন।

এবং নম্বর লিখছে ভূমিত্রী।

কারণ ভূমিত্রীর ওপর সুখলতার আস্থা আছে। যাকে-তাকে আবার এ-খাতায় লিখতে দেওয়া হয় না কিনা।

সুখলতা হারছিলেন। ফলে আবহাওয়া ভয়াবহ, থমথমে।

সকলের চোখে-মুখে হাসির ভুড়ভুড়ি উঠছে। কিন্তু কেউ প্রাণ খুলতে পারছে না মুখ খুলতে পারছে না।

কারণ খেলায় সুখলতার নম্বর স্ফীত হয়ে উঠতে থাকলে আনুপাতিকভাবে উনি আরও স্ফীত হন। এমন পরিস্থিতিতে কথাবার্তা-হাসিঠাট্টা উনি বরদাস্ত করেন না, বেশী বাড়াবাড়ি করলে মেদের পাহাড়ে আগুন লাগে, ভূমিকম্প হয়।

সেই বিভীষিকায় সবাই তটস্থ।

খেলার প্রথম দিকে শিবেনের ঘুম পাচ্ছিলো, কিন্তু এখন তারও ঘুম ছুটে গেছে।

বিকেলের চা-ইত্যাদির পাট চোকার পর রোদ যখন প'ড়ে এসেছে ভূমিত্রী শিবেনকে নিয়ে বেরুলো।

পার্কে গিয়ে বসলো দুজনে একটা বেঞ্চিতে।

আষাঢ়ে দিন। তিন-চারদিন পরে সূর্যের দেখা মিলেছে। ফলে এই ছুটির দিনের নিরাপদ অপরাহ্নে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হুটোপুটিতে পার্কের বাতাস ইতিমধ্যেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'আচ্ছা শিবেন'—অন্যমনস্ক বিষণ্ণ গলায় ভূমিত্রী আচমকা বললো, 'তুমি এমন কাউকে জানো যে আত্মহত্যা করেছে? মানে, তোমার খুব ঘনিষ্ঠ কোন লোক, তোমার সঙ্গে অনেক দিনের জানাশোনা। তাছাড়া যখন আত্মহত্যা করেছে তার আগে প্রত্যেক দিনই তোমার সঙ্গে দেখাশোনা হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ শুনলে যে সে আত্মহত্যা করেছে। আছে কেউ?'

শিবেন রেগে গেলো। বললে, 'হঠাৎ তোমার এর'ম কথার মানে?'

'বলোই না।'

'এর'ম অলুক্ষণে কথা খবদ্দার আমার কাছে বলবে না। আত্মহত্যার মতলব হয়েছে নাকি!'

'বলো না বাবা, আমি একটা জিনিস বুঝতে চাই। নয়তো কি আর জিগ্যেস করতাম?'

'তুমি চুপ করবে? না আমি উঠে যাব?'

'যারা আত্মহত্যা করে, তারা কি সত্যিসত্যিই একেবারে ঠিক ক'রে ফেলতে পারে যে তারা আত্মহত্যা করবে? ইস কী সাংঘাতিক। আমার তো ভাবতেও কেমন লাগে। সত্যি মানুষ যে কত রকম আছে! তাছাড়া যারা আত্মহত্যা করে তাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কি তার চালচলন কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারে যে সে আত্মহত্যা করবে? তা তো পারে না। কারণ তা পারলে আর কী ক'রে ঐ জঘন্য কাজটা হয়? যত আত্মহত্যার খবর শুনি সর্বত্রই একটা খবর থাকবেই: যে আত্মহত্যা করেছে সে লিখে রেখে গেছে যে তার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর রাগ ক'রে সে চ'লে যাচ্ছে অথচ চ'লে যাবার আগে সে কারো ওপর কোন প্রতিশোধের কথা ভাবছে না। তার মৃত্যুর জন্যে যাতে কেউ হাঙ্গামায় না পড়ে সেজন্যে তার কত চিন্তা। অথচ শুনতে পাই আত্মহত্যা নাকি সাময়িক বিকারের ঘোরে না পড়লে হয় না। কিন্তু এই নাকি বিকারের লক্ষণ? কতরকম কারণে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায় তাই নিয়ে একদিন—'

শিবেন দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ভূমিত্রী শিবেনের হাত ধ'রে টেনে বসিয়ে দিলো।

'এ প্রসঙ্গ বাদ না দিলে আমি সত্যি বলছি উঠে চ'লে যাব'—শিবেন রাগতভাবে বললো।

ভূমিত্রী বিরক্তিবোধ করলো। আচ্ছন্নভাবে সে ব'সে রইলো শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

এবং তার এই মুখের দিকে তাকিয়ে শিবেনের মুখে কোন কথাই যোগালো না ভয়ে।

'চীনেবাদাম কেনো'—ভূমিত্রী অনুরোধ করলো।

সাগ্রহে শিবেন এই কাজটা করলো। চীনেবাদামওয়ালাকে ডেকে সে দু-ঠোঙা চীনেবাদাম নিলো।

এরপর শিবেন মনের মধ্যে বেশ যেন খানিকটা মহলা দিয়ে অবশেষে, ঢোঁক গিলে, বললো, 'আচ্ছা দিদি, একটা কথা জিগ্যেস করি ?'

'করো।'

'রাগ করবে না তো ?'

'করব না, বলো।'

'প্রভাতবাবুর সঙ্গে তোমার কি ঝগড়া হয়েছে ?'

'হঠাৎ এ-কথা ?'

'হঠাৎ আবার কী। তুমি কি মনে করো আমি এতই বোকা !'

'তুমি ? তোমাকে কী মনে করি সে-কথা থাক এখন। যদিও তোমার এ-কথারও আমি উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিনে ভাই। এ-কথাই বা বললে কেন ?'

'এত জেরা করলে কিছুই বলা যায় না।'

'আচ্ছা কী বলবে বলো।'

শিবেন চুপ ক'রে রইলো।

'কী হ'লো ? বলো না কী বলবে। এত সঙ্কোচের কী দরকার। আমি কিচ্ছু মনে করব না, বলো।'

'নাঃ হয়তো বেফাঁস কিছু হয়ে যাবে তখন যা-তা বলতে শুরু করবে আবার।'

'কী তোমাকে যা-তা বলেছি কবে ? বলো না, এইজন্যেই তোমার ওপর রাগ ধরে।'

'প্রভাতবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছ কেন জানতে ইচ্ছে করে।'

'কে বললো ঝগড়া করেছি ? প্রভাতবাবু ?'

'না না তার সঙ্গে তো আমার ভালো ক'রে আলাপই নেই বলতে গেলে। আমাকে উনি এ-কথা বলতে যাবেন কেন ?'

'তাহ'লে কী ক'রে বুঝলে ঝগড়া হয়েছে ?'

'কী ক'রে বুঝলাম তা নিয়ে এত খোঁচাচ্ছ কেন। যেমন ক'রেই হোক না কেন। যদি এ-বিষয়ে আমার কাছে কিছু বলতে আপত্তি না থাকে তাহ'লে বলো শুনি। নয়তো আমি পেড়াপীড়ি করব না।'

'তা আমি জানি। ঝগড়া একটু হয়েছে তা তো ঠিকই। ভদ্রলোকের কথাবার্তার মানে সব সময় কেমন বুঝতে পারি না। ঐ জন্যেই রাগ লাগে। আচ্ছা ওঁকে তোমার কেমন লাগে ? সত্যি কথা বলবে কিন্তু। আমি জানি তুমি মিথ্যে কথা বলো না কখনো। তবু আর কি বলছি। মানে, মন-রাখা কথা শুনতে চাইনে আর কি।'

'আমাকে উল্টো ফ্যাসাদে ফেলছ কেন। এ-সব ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের কি কোন হাত আছে ?'

'কী সব ব্যাপার ?'

'দিদি হয়ে তোমার কি উচিত হচ্ছে কথাটা আমাকে দিয়ে বলানোর !'

'ও বলতেই যত বাধা, শুনতে নয় !'

দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার আবছায়া ইতিমধ্যে ঘন হয়েছে। পার্কের ফিকে আলোগুলি জ্ব'লে গেছে। বাচ্চাদের দল উচ্চ কলরবে ঘরে ফিরছে, সমাগম হচ্ছে বড়োদের। আকাশচারীরাও ডানা বিস্তার ক'রে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে চলেছে যে-যার আস্তানায়।

'বললে না তো ?'—ভূমিত্রী আবার জিগ্যেস করলো।

'কী ?'

'ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা।'

'আমার সঙ্গে তো উনি ঠিক মেশেনই না। দূর থেকে কি কারো সম্বন্ধে কিছু বলা যায় ?'

'যতটুকু বলা যায় ততটুকুই শুনি।'

'অফিসশুদ্ধ সকলেই যে ওঁকে খুব প্রশংসার চোখে দেখে সে তো তুমি জানোই।'

'তাই নাকি ? না, এতটা জানি না তো। এত প্রশংসার কারণ ?'

শিবেন উত্যক্ত হয়ে বললো, 'তা জানিনে। তবে আমারও ওঁকে খুবই ভদ্রলোক ব'লে মনে হয়। দোষের মধ্যে শুধু—'

'কী ? বলো ?'

'একটু অহঙ্কারী ব'লে মনে হয়। তা যারা আর পাঁচজনার চাইতে একটু

স্বতন্ত্র তাদের বোধ করি অহঙ্কার একটু থাকেই। যদিও অহঙ্কার সময়-সময় খুব ক্ষতিকারক।'

'নাকি! যেমন?'

'তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছ?'

ভূমিত্রী তাড়াতাড়ি শিবেনের একটা হাত নিজের দু-হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে নিবিড় গলায় বললো, 'না না তোমাকে ঠাট্টা করব কেন। ওঁর অহঙ্কার কী দেখেছ বলো। আমার বোঝা দরকার।'

'প্রভাতবাবুর এক বন্ধু আমাকে বলছিলো কথাটা। তুমিও চিনবে। ঐ যে স্যালারি সেক্‌শনের গৌতম রায়। বলছিলো, তার উচ্চাশা এত বেশী যে তার বর্তমান অবস্থায় তা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। যতটুকু পূর্ণ হওয়া সম্ভব ততটুকুই যদি সে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করত, অর্থাৎ নিজের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি সে নিজের সামঞ্জস্য ক'রে নিতে পারত তাহ'লেও সে জীবনে অনেক কিছু করতে পারত। কিন্তু তা যে সে করতে নারাজ। নিজের অহং-বোধ তার এমনি প্রবল যে অল্প সম্পদ অর্জনের জন্যে সে নিজেকে কাজে লাগাবে না। ফলে ফ্রাস্ট্রেশন! নিজের ওজন না বুঝলে যা হয়। গৌতম বলছিলো, প্রভাতবাবু সাহিত্য বা গান দু-দিকেই যথেষ্ট উন্নতি করতে পারতেন। সে-প্রতিভা নাকি তাঁর আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শুনলাম, তিনি সাহিত্যিকদের আর গাইয়েদের দলাদলি আর মারামারি দেখে ভয়ে পালিয়ে এসে ঘরে ব'সে আছেন।'

ভূমিত্রী হেসে উঠলো।

কথাটা যে হাস্যকর সেটা, বলার পরে, শিবেনও বুঝতে পারলো। সে-ও হাসলো।

একটু অপ্রস্তুতভাবে শিবেন তার বক্তব্যটা পরিষ্কারভাবে বলবার চেষ্টা করলো, 'মানে কী জন্যে তিনি সাহিত্য বা গান দুইই ছেড়ে দিয়েছেন তা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছিনে বটে, কিন্তু এটা তো ঠিকই যে এ-দুটো বিষয়েই তাঁর প্রতিভা ছিলো। চর্চা করলে নিশ্চয়ই উন্নতিও হত। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও নিশ্চয়ই ছিলো। ছেড়ে দিয়ে কী লাভটা হ'লো? গৌতম বলছিলো, লেগে না থাকলে কিছুই হয় না। অধ্যবসায় চাই সাধনা চাই তবে তো সিদ্ধিলাভ হবে। ভগবানকে পেতে হলে ভক্তকে পথের ধুলোয় দণ্ডী দিতে দিতে যেতে হয়, সকলের কাছে নিজেকে নত করতে হয়, অহং-বোধ নিয়ে সত্য লাভ হয় না। অহং-এর আহুতি দিতে পারলেই যজ্ঞের আগুন পবিত্র—ও কী তুমি হাসছ?'

ভূমিত্রী খেয়াল করেনি যে তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিলো, শিবেনের

হঠাৎ ভাবের ঘোরে বক্তৃতা শুরু হয়ে যাওয়াতে তার খুব মজা বোধ হচ্ছিলো, কিন্তু ওর এই ভগবৎ-ভক্তিকে ভূমিত্রী পারতপক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে না। জানে তা করলে বেচারার কোমল সরল প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত লাগে। ভূমিত্রী অনুতপ্ত মুখে আবার শিবেনের হাত চেপে ধরলো।

বললো ভূমিত্রী, 'এ-বিষয়ে প্রভাতবাবুর সঙ্গে যে আমার কোন কথাই হয়নি তা নয়। তোমার এই অভিযোগ আমিও তুলেছিলাম তাঁর কাছে। কিন্তু সে তো হেসেই উড়িয়ে দিলে কথাটা। বলে, সাঁতার একবার শিখলে কি আর ভোলা যায়? ফলে ছেড়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে সাঁতার জানলেই যেমন সাঁতারু হওয়া যায় না, সাহিত্য বা গানে দখল থাকলেই তেমনি সাহিত্যিক বা গাইয়ে ব'লে পরিচিতি পাওয়া যায় না, এই ওর কৈফিয়ৎ।'

'এতেই তুমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে!'

'আরে কী মুশকিল, আমার সন্তুষ্ট হওয়া-হওয়ির কী আছে। যার কাজ সে তা না পারলে না-হক দোষারোপ ক'রে কী লাভ? তাতে কি কাজ উদ্ধার হবে?'

'না আমি দেখেছি। প্রভাতবাবুর বেশ একটু নিক্রিয় উদাসীন ভাব আছে। ওটা ভালো না।'

'আঁহা রে গুরুঠাকুর আমার! সে-দোষ তো আপনারও আছে! এখনো পর্যন্ত একটা বিয়ে ক'রে উঠতেই পারলেন না, আবার চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা!'

'আমার তো সে-ক্ষমতাই নেই'—শিবেন প্রসঙ্গটাকে লঘু হয়ে যেতে দেবে না বোঝা গেলো, উত্তেজিত গুরুগম্ভীরভাবেই সে বললো, 'কিন্তু প্রভাতবাবু করেন না কেন?'

'তা প্রভাতবাবুকেই জিগ্যেস কোরো। কিন্তু শিবেন্দ্র নারায়ণ তরফদার মহাশয়কে কি এ-কথা জিগ্যেস করতে পারি যে তাঁর মাথায় এ-কথা কে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে—'

'ঐ এক কথা বারে-বারে তুলে কী লাভ বলো তো দিদি। ও-কথা ছেড়ে দাও, আমার যা জিজ্ঞাস্য ছিলো সে-কথা কিন্তু তালেগোলে চাপা প'ড়ে গেলো। এবারে—'

'ওমা ওমা ওমা'—ভূমিত্রী হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'প্রভাতবাবু যাচ্ছে না? আরে আরে আমাদের বাড়িতেই যাচ্ছে নিশ্চয়। ডাকো ডাকো।'

শিবেন ডেকে উঠলো। কিন্তু শিবেনের গলা ক্ষীণ ব'লেই হোক অথবা অন্য

যে-কোন কারণেই হোক প্রভাত শুনতে পেলে না। শিবেন তখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে প্রভাতকে ধ'রে নিয়ে এলো।

'কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে কেন দুজনেই, বসুন? বোসো শিবেন?'

'সেই সাতসকাল থেকে শুরু ক'রে তোমার সঙ্গে কথা ব'লে ব'লে মুখে ব্যথা ধ'রে গেছে'—শিবেন হেসে বললো, 'আমি আর বসব না, আমি এবারে বিদায় নেব। আপনি বসুন প্রভাতবাবু।'

প্রভাত অপ্রস্তুত বোধ করছিলো।

'কাল যাবে তো অফিসে, দিদি?'—শিবেন জিগ্যেস করলো।

'যদি ম'রে না যাই, তাহ'লে।'

'কী যে মরণ-মরণ বাতিক হয়েছে ছেলেমানষের মতো, প্রভাতবাবু একটু ব'কে দেবেন তো। আচ্ছা আমি চলি। আবার কাল দেখা হবে।'—ব'লে শিবেন পেছন ফিরলো।

প্রভাত বসলো।

শিবেনকে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেলো ততক্ষণ দুজনের কেউই কথা বলতে যেন ভুলে গেলো।

গোটাকয়েক চামচিকে কোথা থেকে উড়ে এসে ওদের মাথার ওপর কিছুক্ষণ ডানা ঝটপটিয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

'চাকরিও ছেড়ে দিলেন নাকি ?'—অবশেষে ভূমিত্রী শুরু করলো।

'না। দিন কয়েকের ছুটি নিয়েছি।'—প্রভাত উত্তর দিলো।

আবার চুপচাপ। প্রভাত আসবার সঙ্গেসঙ্গেই সময় যেন জগদ্দল পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে। তরল জ্যোৎস্নার সমুদ্রে মহাকালের বিশাল পাথর অচল হয়ে নেই বলাই বাহুল্য, কিন্তু তা যেন আপাতত উভয়েরই গলায় ঝোলানো হয়েছে! ফলে সময়ের ভারে তারা দুজনেই তলিয়ে যাচ্ছে।

'কত দিন ?'—ভূমিত্রী আবার মুখ খুললো।

'পনেরো।'

'আর কত দিন বাকি আছে ?'

'এই সাত-আট দিন হবে।'

'হঠাৎ ছুটি নিলেন যে ?'

'এমনি-ই! খুব ক্লান্ত লাগছিলো।'

'তারপরে ? ক্লান্তি কাটছে ?'

'না। সেইজন্যেই এসেছি!'

'তার মানে ?'

'তার মানে ভেতরে গোলমাল রেখে বাইরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আপনার সঙ্গে একটা গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিলো। সেইটে মেটাতে এসেছি।'

'বলেন কি! তাহ'লে তো আমারও খুশী হবার কথা! তা আরম্ভ করুন!'

'কী আরম্ভ করব ? আমি কিছু মুখস্থ ক'রে আসিনি তো ?'

'করেননি ? এলেনই যদি, তৈরী হয়ে তো আসতে হয় ?'

'শান্তি প্রতিষ্ঠার শর্ত একতরফা তো হবে না।'

'আপনার নিশ্চয়ই কিছু প্রস্তাব আছে ?'

'তা আছে। আমার প্রস্তাবের মুখবন্ধে যেটা বলা দরকার সে হচ্ছে এই যে, আমার ধারণা হয়েছে যেদিন আপনি আর আমি একসঙ্গে অফিস থেকে ফিরলাম, মানে যেদিন আপনার জন্মদিন ছিলো, সেদিন আমি এমন কতগুলো প্রশ্ন

তুলেছিলাম যাতে আপনি বেশ চটেছিলেন। আমার এটা মনে হবার কারণ এই যে, তারপর থেকেই অফিসে আপনি আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছেন। অবিশ্যি আপনি যদি আমার সঙ্গ পরিহার করতে চান, তা আমাকে জানিয়ে দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হব এবং সেক্ষেত্রে অন্য কোন প্রস্তাবের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যেহেতু আমার ধারণা আপনি তা চান না সেহেতু—'

'কী হ'লো ?'

প্রভাত তার দীর্ঘ বক্তব্যটা মেঠো বক্তৃতার ঢঙে শুরু করেছিলো এবং গোড়ার দিকে বেশ বাগ্মিতা দেখাতেও পেরেছিলো—কিন্তু শেষের দিকে যেন তার দম ফুরিয়ে এসেছিলো, জিভ রসশূন্য হয়েছিলো এবং শেষ পর্যন্ত কথার খেই হারিয়ে শোচনীয় পরিস্থিতিতে গিয়ে পৌছেছিলো। চুপ ক'রেই রইলো সে।

'বাঃ বলুন ?'

'যতটুকু বলেছি সেই সম্বন্ধেই আপনার মন্তব্য শুনি আগে ?'

ভূমিত্রীর ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিলো প্রভাতকে মারাত্মকভাবে একটা আঘাত করে। কিন্তু প্রভাতের মুখে উত্তেজনা আর ক্লান্তির যে মিশ্রিত চেহারা প্রকট হয়ে উঠেছে তার ওজন ভূমিত্রীর বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি, এবং এই মুখ দেখে ভূমিত্রী নিজেকে সামলে নিলো। ভয়েই হোক মমতাতেই হোক তার চোখের দৃষ্টিতে স্বাভাবিকতা, কোমলতা ফিরে এলো। বললো সে, 'আপনার ধারণা ঠিক। এবারে বলুন ?'

প্রভাত কিন্তু এরপরও চুপ ক'রেই রইলো। পশ্চিম আকাশে শুক্র গ্রহ জ্বলছে একটা হীরের টুকবোর মতো, সেই দিকে তাকিয়ে প্রভাত বিকল হয়ে রইলো।

প্রভাতের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ঐ হীরের টুকরোটির দিকে চোখ পড়তেই ভূমিত্রীর মনে পড়লো প্রভাতের ফুলকাকীমার কথা।

'আচ্ছা এ-ঝগড়া এখন মুলতুবী থাক। এতদূর কষ্ট করে এসেছেন, এর ওপর আবার ঝগড়া করলে ধর্মে সইবে না। সে পরে হবে 'খন ধীরে সুস্থে। আপনার ফুলকাকীমার কী খবর বলুন।'

প্রভাত তবুও নীরব।

'কী হ'লো ? কথা বলবেন না নাকি আর !'

'ফুলকাকীমার যে-খবর বলব তা শুনে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন না।'

'তবু বলুন শুনি। ওঁকে একবার দেখাতে পারেন ? আমার খুব ইচ্ছে করে ওঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি। আপনারা তো তাঁকে পাগল ঠাউরে রেখেছেন!'

'দেখানো আর সম্ভব নয়।'

ভূমিত্রী চমকে উঠলো। বললো ব্যথিত গলায়, 'সে কী ?'

'না না মারা যাননি। অথবা গেছেন কি না তাও জানিনে। নিখোঁজ।'

'তার মানে ?'

'মানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চ'লে গেছেন একা। কোথায় গেছেন কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এ কবে হ'লো ?'

'আপনার সঙ্গে যেদিন ঝগড়া ক'রে গেলাম সেদিন রাত্রেই।'

'তাহ'লে তো তিন মাস।'

'তাই।'

'সেই থেকে কোন খোঁজ নেই ? কী ভয়ানক। তা সেদিন রাত্রে উনি কোথায় ছিলেন ?'

প্রভাত তখন সম্পূর্ণ কাহিনীটা বললো।

যখন শেষ করলো সূর্য তখন অস্ত গেছে। পার্কের ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদটা শুধু হালকা মেঘের দলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পশ্চিম আকাশের দিকে একটু একটু এগোচ্ছিলো।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে শেষে ভূমিত্রী বললো, 'এখন আর ব'লে লাভ কী, কিন্তু তবুও আমি বলব আপনার উচিত ছিলো বাধা দেওয়া। আপনার ঠাকুমা যখন ওঁকে ঘর থেকে বের ক'রে দিচ্ছিলেন, তখন নিরীহ দর্শকের মতো কী ক'রে যে তা সহ্য করলেন তাই ভাবি। আপনাদের মনটা কী ধাতুতে তৈরী ভেবে সত্যি অবাক হয়ে যাই।'

'আপনাকে আমি একদিন সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম বোধ হয়'—প্রভাত তীব্র প্রতিবাদে বললো, 'সহানুভূতি বিতরণের ব্যাপারটা পাইকারী হারে চালাবেন না। যে ব্যাপারে নিজের কোন দায়িত্ব নেই সে ব্যাপারে অন্তত চুপচাপ থাকার অভ্যেস করবেন।'

'স্বার্থে আঘাত লাগলে কথাবার্তা এমনই হয় তা আমি জানি!'—ভূমিত্রী চরম শ্লেষে বললো।

'হাঁ আমি স্বার্থের দাস। সে-বিষয়ে আমি সচেতন। তারপর আপনার কী বলবার আছে বলুন।'

'এই দাসত্ব কাটিয়ে উঠুন! আবার কী বলব।'

'কাটিয়ে ওঠার উপায় বাৎলে দিতে পারেন ?'—প্রভাতের গলায় তির্যক ব্যঙ্গ।

'পারি'—ভূমিত্রীও সমান উষ্মার সঙ্গে বললো, 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমার মতো অধমের কাছ থেকে কোন শিক্ষা নিতে আপনার অহমিকায় আটকে যাবে!'

'তাহ'লে আগে অহমিকার চিকিৎসাই করুন!'

'হ্যাঁ তাও করব! শুধু আমার কথার জবাব দিয়ে যাবেন অনুগ্রহ ক'রে। এইটুকু সৎসাহস যদি থাকে তাহ'লেই আপনার রোগ সারবে।'

'বটে!'

'আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি আপনি অনেক সময়ই তিলকে তাল আর তালকে তিল করেন!'

প্রভাত কাষ্ঠহাসি হাসলো। বললো, 'এটা কি প্রশ্ন না মন্তব্য?'

'প্রশ্ন। কেন করেন বলুন।'

'করি স্বার্থের দাস ব'লে!'

'হ্যাঁ ঠিক তাই। এর ওষুধ হচ্ছে যে-ক্ষমতার বলে আপনি তা করেন, মানে আপনার পক্ষে সত্যিই তা করা সম্ভব, সেই ক্ষমতাকে নষ্ট ক'রে দেওয়া। সাফাই তৈরী করবার, যুক্তি তৈরী করবার, আপনার অসাধারণ শক্তি আছে আমি দেখেছি। সব কিছুরই চুলচেরা বিশ্লেষণের অজুহাতে আপনি এই কাজটা করেন। অথচ এইটে আপনার কি একবারও খেয়াল হয় না যে, জীবনকে অত কুচি-কুচি ক'রে কাটলে জীবনটাই মার খেয়ে যায়? আপনি কি যুক্তির খাতিরেও একথা স্বীকার করবেন না যে, কোন একটা বিষয় নিয়ে দীর্ঘসূত্রীর মতো চুলচেরা বিশ্লেষণে জীবন কাটিয়ে না দিয়ে তা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করাই বুদ্ধির কাজ, বিবেকের কাজ? সত্যের আসল উপলব্ধি একমাত্র তাইতেই সম্ভব, আপনি কি তা সত্যিই বোঝেন না?'

'কী হ'লো? দাঁড়ান দাঁড়ান আপনার বক্তৃতাটা একটু বুঝে নিতে দিন। কী বললেন, চুলচেরা বিশ্লেষণ বনাম সামগ্রিক গ্রহণ? কী নিদারুণ প্রশ্ন!'—প্রভাত আবার কসরৎ ক'রে-ক'রে কাষ্ঠহাসি হাসলো এবং চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'সম্প্রতি এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের এক বিখ্যাত বইয়ের বিজ্ঞাপনেও যেন ঠিক এইরকম একটা কথা দেখেছিলাম মনে পড়ছে। লাইনটি সম্ভবত এই: তিনি জীবনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে বৃথা সময় নষ্ট করেননি, জীবনকেই গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞাপনটা প'ড়ে আমার একটি কথাই মনে হয়েছিলো, আপনার এ-প্রশ্নের উত্তরেও আমার সেইটিই জবাব। তা হচ্ছে এই যে: তিনি কোন খাদ্যদ্রব্য মুখের মধ্যে পেলে চর্বণের ব্যাপারে বৃথা সময় নষ্ট করেননি, কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলে খাদ্যদ্রব্যকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছেন!'

'ব'সে ব'সে জাবর কাটার চাইতে সে অনেক ভালো।'

প্রভাত আবার সেই বিশ্রী হাসি হাসলো এবং বললো, 'জাবর সেই সব প্রাণীদেরই কাটতে হয় যারা গিলে ফেলবার আগে বিশেষ চিবোয় না। চিবিয়ে চিবিয়ে যারা গেলে তারা তো জাবর কাটে না!'

'এ আপনার যুক্তির জন্যই যুক্তি! আমি শুষ্ক প্রাণহীন যুক্তিবাদের কূট চর্চা করি না। কাজেই আপনার সঙ্গে তর্কে আমি তো পেরে উঠবই না।'—ভূমিত্রী অসহায়ের মতো হাল ছেড়ে দিয়ে বললো।

'ও! আপনি যখন পেরে উঠবেনই না, তখন আপনার পেরে ওঠার কোন দরকারও বোধ করি নেই? কাজেই আপনিই জিতলেন!'

'আপনি কি ঝগড়া ছাড়া আর কিছুই জানেন না?'—ভূমিত্রী সহসা ভেঙে প'ড়ে বললো।

'না। আমি নিজের সঙ্গেও ঝগড়া করি। অষ্টপ্রহর। সম্ভবত প্রতিটি মুহূর্ত!'

'সেও আপনার আরেক ব্যাধি। মাত্রাহীন আত্মসমালোচনা। ওতে লোক পাগল পর্যন্ত হয়ে যায় শুনেছি।'

কথাটায় ভূমিত্রী স্পষ্টই বুঝলো প্রভাতের মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া হ'লো। কথা ঘোরানোর জন্যে সে তাড়াতাড়ি বললো, 'ফুলকাকীমার মেয়েগুলির খবর কী? আছে কোথায়?'

'তাদের দিদিমার কাছে। আগে যেমন ছিলো।'

'ভালো আছে? কান্নাকাটি করে না?'

'জানিনে।'

'জানলে কী হয়?'—এই কথাটা বলতে গিয়ে ভূমিত্রী নিজেকে সামলে নিলো, প্রভাত পাছে আবার খাপ্পা হয়ে ওঠে এই ভয়ে সে কথাটা বলতে গিয়েও বললো না।

'ক'টা বাজে দেখুন তো?'—প্রভাত জিগ্যেস করলো।

ভূমিত্রী যেদিকে অন্ধকার কিছুটা স্বচ্ছ সেদিকে ঘড়ি তুলে দেখবার চেষ্টা করলো, বললো, 'কীজানি বুঝতে পারছি না, আপনি দেখুন তো'—ব'লে ভূমিত্রী তার বাঁ হাতটা প্রভাতের কাছে এগিয়ে দিলো।

মুহূর্তে প্রভাতের মনের মধ্যে ভেসে উঠলো, দিন সাতেক আগে ট্যাক্সির মধ্যে নভসির হাতের ঘড়ি দেখার অছিলায় সেই কেলেঙ্কারির দৃশ্যটা।

'আপনিই পারলেন না, আমি কি পারব?'—ব'লে প্রভাত ভূমিত্রীর হাতটা,

যেন নিতান্ত ভদ্রতারই খাতিরে, একবার ছুঁয়েই ছেড়ে দিলো, ঘড়ি দেখার কোন চেষ্টাই করলো না। বললো, 'ওঠা যাক, অনেক রাত হয়েছে।'

'আবার কবে আসবেন ?'—পার্কের বাইরে এসে ভূমিত্রী জিগ্যেস করলো।

'দেখি।'

'যেজন্যে এসেছিলেন তা কি মিটলো ?'

'কীজানি, ঠিক বুঝতে পারছি না !'

'ওঃ ! বুঝতেই পারছেন না !'

'আপনি তো রায় দিয়েই দিলেন যে আমি ঝগড়া ছাড়া থাকতে পারিনে। তাই যদি হয়, তাহ'লে ঝগড়া মেটানোর আশা দুরাশা।'

'নভসির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না ?'

'হ্যাঁ এই দিন সাতেক আগে হয়েছিলো।'

'ছুটি নেবার আগে ? না পরে ?'

'আগে। কেন বলুন তো ?'

'এমনিই। ওর সঙ্গেও তো আপনার ঝগড়া হয় বলেন, শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যে ওর সঙ্গেও যাবেন না একদিন মিটমাট করতে ?'

'ভেবে দেখব।'

'নভসির নাকি আমাকে দেখতে খুব শখ, প্রায়ই বলেন, তা নিয়ে আসুন না কাল ?'

'না কালকে হবে না'—ব'লেই প্রভাত আর কথা না বাড়িয়ে পেছন ফিরলো, হাত তুলে বললো মুখ ফিরিয়ে, 'যদি পারি দু-তিন দিন বাদে আসব সন্ধের পরে। চলি।'—ব'লে প্রভাত হনহনিয়ে চ'লে গেলো।

১২

ডাক্তার বলেছেন হিস্টিরিয়া। রোগের লক্ষণ দেখেশুনে মুখ বেশ গম্ভীর ক'রে গেছেন। একটি ইনজেকশনও দিয়েছেন। ব'লে গেছেন, রোগিনীর প্রতি বাড়ির লোকদের নির্দয় হতে হবে। এখন বেশ কিছুদিন ওর প্রতি কোমল, স্বাভাবিক, সদয় ব্যবহার করা ওর পক্ষে ক্ষতিকর হবে। ওকে দেখে মুখ গম্ভীর করতে হবে, বাড়িতেই যথাসম্ভব আটকে রাখতে হবে অন্তত দিন কয়েক এবং আবার ফিট হলে চোখেমুখে জলের ছিটে নাকে অ্যামোনিয়ার শিশি হেনতেন ওষুধপত্র যা দেবার দিতে হবে। এবং অসম্ভব না হ'লে অবিলম্বে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।

ফলে নভসির মা কমলাদেবী কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন দিনরাত। মেয়ের প্রতি এক মুহূর্তের জন্যেও কোনকালেই তিনি নির্দয় নিষ্ঠুর হননি। তা হওয়া তাঁর পক্ষে আসলে অসম্ভব। ঝি-চাকরের ওপরও তিনি কোনদিন গরম মেজাজ দেখিয়েছেন কিনা সন্দেহ। আজ মা হয়ে নভসিকে দেখে মুখ গম্ভীর করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সে ডাক্তারই বলুক আর যেই-না বলুক।

নভসির বাবা চন্দ্রমাধবের এ-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কই। প্রবৃত্তিও নেই। এ নিয়ে ঝামেলা পোয়ানো তাঁর কোনদিনই আসে না। অথচ স্ত্রীর কান্নাকাটিকে তিনি যথাসাধ্য মূল্য দিয়ে থাকেন। তাই বড়োছেলে পৃথ্বীশকে ডেকে তিনি যা করার করতে ব'লে দিয়েছেন। চিকিৎসার ব্যাপারে টাকাপয়সার কার্পণ্য যেন না হয় এই কথাটি তিনি একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আপন উদ্যোগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ডিঙিয়ে পৃথ্বীশ আয়কর আপিসে সরাসরি পয়লা শ্রেণীর অফিসার-পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে এই বছরখানেক। তিরিশে পৌঁছতে তার এখনো চার বছর, এরই মধ্যে এত, ফলে সোনার ভবিষ্যৎ আপন হস্তে গড়বার নেশায় সে মশগুল। এর ওপর আবার সম্প্রতি সে একটি মেয়েকে বিয়ে করবে কিনা ভাবছে : মেয়েটিকে তার পছন্দই হচ্ছে—কাজেই বাবা দায়িত্ব দিলেও এবং নিয়মতান্ত্রিক আনুগত্যের সঙ্গেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করলেও সে নভসির এই উটকো অসুখটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিলে না।

ফলে নভসিকে সামলাবার সম্পূর্ণ দায়িত্বটাই আসলে পড়লো গিয়ে এ-বাড়ির পুরনো ঝি মোক্ষদার ওপর। এ সব অসুখ সে বহুত দেখেছে, এর নানান দিশী মতের ওষুধ তার জানাও আছে, সুতরাং সেও বিশেষ ঘাবড়ালে না। শুধু বাড়ির বৃদ্ধ সরকারকে সে লাগিয়ে দিলে পাত্রর খোঁজ আনবার, পৃথ্বীশকে খুঁচিয়ে পত্রিকায় 'পাত্র-চাই'-এর বিজ্ঞাপন দেওয়ালো এবং নিজেও সে কোথা থেকে এক ঘটককে খুঁজে-পেতে এনে কাজে লাগিয়ে দিলে।

প্রভাতের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে রাগের মাথায় নভসি সেই যে বাসে উঠে পড়েছিলো, সেই উত্তেজনাই তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিলো। বাসের মধ্যেই সমস্ত শরীরে তার দারুণ অস্বস্তি বোধ হয়েছিলো, হাত-পা ছুঁড়ে বেমক্কা চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিলো, চোখের সামনের লোকজন কেমন যেন সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিলো। প্রাণপণ চেষ্টায় সে বাসের মধ্যে নিজেকে ঠিক রাখতে পেরেছিলো, বাস থেকে নেমেই একটা রিক্সা করেছিলো, রিক্সা থেকে নেমে টলতে টলতে নিজের ঘর পর্যন্তও সে যেতে পেরেছিলো—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর গুঁড়িয়ে-দেওয়া কান্না তাকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করেছিলো। এবং তারপরই ফিট।

সেদিন রাত্রেই তার আরো একবার ফিট হয়েছিলো। দ্বিতীয়বার ফিটের আগে শুধুই কান্নার ঝাপটা নয়, তার সঙ্গে দমকা হাসিও নভসির চোখ-মুখ সর্ব দেহে বিভীষিকার রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিলো। রাত তখন এগারোটা। তখুনি ডাক্তার আনানো হয়েছিলো। এবং সেদিন প্রায় সমস্ত রাত কমলাদেবী মেয়ের শিয়রে ব'সে চোখের জল ফেলেছেন। মোক্ষদাও সেই রাত থেকে রোজই নভসির ঘরের মেঝেয় নিজের বিছানা করছে। নভসির ক্রুদ্ধ আপত্তি সত্ত্বেও।

তারপর একটি সপ্তাহ পার হয়েছে। এর মধ্যে আরো তিনবার রোগের আক্রমণ হয়েছিলো। তিনবারই সন্ধের একটু পরে।

মোক্ষদা অবিশ্যি ওঝা ডাকতে চেয়েছিলো। সে প্রথম থেকেই ব'লে আসছে দিদিমণির ওপর অপদেবতার ভর হয়েছে। ভূতের ওঝা ছাড়া এ-অসুখ কেউ নামাতে পারবে না। কিন্তু পৃথ্বীশের ধমক খেয়ে মোক্ষদা নিতান্ত দুঃখিত এবং স্তম্ভিত মনে আর রা কাড়েনি। তার নিতান্ত স্নেহের ধন নভসি এইভাবে এক ভূতের দৌরাত্ম্যে কষ্ট পেতে থাকবে, তার দাওয়াই জানা থাকা সত্ত্বেও সে অসহায় দর্শকের মতো তাই দেখবে—এর চাইতে দুঃখের বিষয় তার

পক্ষে আর কী হতে পারে। বাড়ির সরকারকে সে সখেদে জানিয়েছিলো, ভূতের যম এক ওঝাকে সে চেনে, সে এসে মন্ত্রটি প'ড়ে গণ্ডীটি কেটে লঙ্কাপোড়া শুঁখিয়ে সরষে-বাণ মেরে পিঠে বাঁশ-ডলা দিয়ে যখন দুই গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের দুই থাপ্পড় মারত টেনে, তখন কোথায় থাকত ভূত, বাপ-বাপ ডাক ছেড়ে সাত হাত নাকখত দিতে দিতে বেটা পালাত, দিদিমণি তখন ফের হেসেখেলে বেড়াতে পারত, কলেজে বেরুতে পারত গানে যেতে পারত— তা না, কী এ হ্যাটকোট-পরা গ্যাটম্যাটা ডাক্তারমুখপোড়া দিয়ে গেছে যত ইঞ্জারি ওষুধ! আরে এ কি ইঞ্জারি রোগ যে ওতে ধরবে। যে-রোগের যে-দাওয়াই। এ হ'লো গে সাবেকী দিশী রোগ, এর চিকিচ্ছে কি বইয়ে লেখে! মোক্ষদা সখেদে কপাল কোটে।

এ-রোগের সঙ্গে নানান উপসর্গও দেখা দিয়েছে নভসির মধ্যে নিতান্ত বিশ্রীভাবে। একদিন রোদসী দুটো আয়না নিয়ে, অভ্যাসমতো নভসিরই ঘরের ড্রেসিং টেবিলে ব'সে, বৈকালিক প্রসাধনে মশগুল ছিলো, অন্যান্য দিনের মতোই গুনগুনিয়ে গানও গাইছিলো,—হঠাৎ নভসি ইজিচেয়ার ছেড়ে বই ফেলে উঠে এসে ছিনিয়ে নিয়েছিলো রোদসীর হাতে-ধরা আয়নাটা, ঘরের মেঝেয় সেটা ছুঁড়ে ফেলে চুরমার ক'রে দিয়েছে, এবং রোদসীর গালে ঠাসঠাস ক'রে দুই চড় মেরে তাকে চুলের বিনুনি ধ'রে টানতে টানতে ঘর থেকে বের ক'রে দিতে দিতে এই ব'লে চেঁচিয়েছে, 'অত বেশি আয়নায় মুখ দেখলে পাগল হয়ে যাবি যে!'

বস্তুত প্রহার-প্রবৃত্তি নেশার মতো নভসিকে পেয়ে বসেছে। ফলে শুধু রোদসীই নয়, বাচ্চা চাকর পানু, বাচ্চা-বয়সের আরো দুটি ভাইবোন নভসির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

শুধু তাই নয়। নভসি নিজেকেও প্রহার করে। ব্লেড দিয়ে নখ কাটতে কাটতে একদিন যখন সে নিজের আঙুল কেটে রক্তারক্তি কাণ্ডটা করলো তখন মোক্ষদা তার সামনে বসা ছিলো। নখ কাটতে নভসির হাতকাঁপুনি দেখে ভয়ে মোক্ষদা বলেছিলো, 'দাও দিদিমণি আমি কেটে দিচ্ছি নখ',—কিন্তু নভসি রাজী হয়নি। মোক্ষদার মনে হয়েছে দিদিমণি যেন ইচ্ছে ক'রেই নিজের আঙুল কেটে দিলো।

খাওয়াদাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে, ঘুমের শান্তি ঘুচে গেছে, তার ওপর আবার সারাক্ষণ বন্দী হয়ে থাকা বাড়ির মধ্যে—ফলে সাতদিনেই নভসির শরীরের অসামান্য লাবণ্যে কর্কশ ছাপ পড়েছে, চোখের কোলে কালি জমেছে,

চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ এবং কুটিল হয়েছে, ছোট ঠোঁটদুটি শুকিয়ে যেন আরো ছোট হয়ে গেছে।

অষ্টম দিনে নভসি দাবী করলো তাকে বেরুতে দিতেই হবে।

কমলাদেবী ছুটে এসে জিগ্যেস করলেন করুণ গলায়, 'কোথায় যাবি খুকী ?'

'ক্লাসে।'

'এখনো তো তোর শরীরের গ্লানি কাটেনি। আরো দুটো দিন না হয় কামাই হত ?'

'না। পার্সেণ্টেজ থাকবে না।'

কমলাদেবী বুঝলেন না জিনিসটা কী। বোঝার চেষ্টাও করলেন না। হাঁপাতে হাঁপাতে গেলেন বড়োছেলের ঘরে।

'ও পৃথ্বী, খুকী কলেজ যাবে বলছে যে ?'

'মরুক গে যাক'—পৃথ্বীশ ব্যক্তিগত ডায়েরি লিখছিলো ইংরেজিতে, লেখা বন্ধ করে বিরক্তিভরে বললো।

'তুই গিয়ে একটু বুঝিয়ে বল না'—কমলাদেবী প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন।

'যাক না তার চেয়ে। ঘরে আটকা থাকলেই কি এ রোগ সারবে!'—পৃথ্বীশ উঠে প'ড়ে পায়চারি করতে করতে, একটু ইতস্তত ক'রে শেষে যেন সেটা কাটিয়ে উঠে, খুব উত্তেজনার মুখে বললো, 'ডাক্তারবাবু কী বললেন কাল জানো ? বললেন, খোঁজ খবর নিতে যে কাউকে ও বিয়ে টিয়ে করতে চায় কিনা। সম্ভব হলে সেই বিয়ে ঘটিয়ে দিতে।'

কমলাদেবী এই বিষয়টি অনুমান করতে পারেননি তা নয়, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কে সেই ছেলে যাকে নভসি চায়। পরোক্ষ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি নভসিকে সোজাসুজিই প্রশ্নটা করেছিলেন, কিন্তু নভসি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে সে কথা।

'অলকাদির ঠিকানা জানো ?'—পৃথ্বীশ জিগ্যেস করলো।

'আমি তো জানিনে, মোক্ষদা হয়তো বা জানে।'

'তো তাকে জিগ্যেস কোরো। তার ঠিকানাটা দরকার। আর ও য়ুনিভার্সিটিতে যাচ্ছে যাক। ক্লাস কামাই করে কী লাভ।'

অতঃপর বিনা বাধায় নভসি বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাঝে-মাঝে সঙ্গীত নিকেতনে এবং তার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের বাড়িতেও যাওয়া শুরু করেছে।

কিন্তু সমস্যা কাটেনি। বিকারের ঘোর পুরো মাত্রাতেই বজায় আছে,

কখনো-সখনো একটু-আধটু কম থাকে এই যা। দু-একদিন পরে-পরেই ফিট-হওয়াটাও অব্যাহত রইলো।

অলকাতিলকা রায়ের ঠিকানা কমলাদেবী প্রথমে নভসির কাছেই চেয়েছিলেন। কিন্তু নভসি কোন উত্তরই দেয়নি সে-কথার। মোক্ষদাও কিছু জানত না, কিন্তু মোক্ষদা গিয়ে সরকারবাবুকে কথাটা বলতেই তিনি তাঁর পুরনো হিসেবপত্রের বোঁচকা নামিয়ে তার থেকে অলকার ঠিকানা বের ক'রে দিলেন। অলকা এককালে এ-বাড়িতে চাকরি করেছে নভসির গৃহশিক্ষিকা হিসেবে, সেই বাবতে সে প্রতি মাসে মাইনে পেয়েছে, ফলে সরকারমশায়ের খাতায় তার নামধাম নির্ভুলভাবে লেখা আছে। সরকারমশায় এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন।

কমলাদেবী সেইটি নিয়ে পৃথ্বীশের হাতে দিয়েছিলেন।

পৃথ্বীশের সংক্ষিপ্ত চিঠির আহ্বানে অলকা কালবিলম্ব না ক'রে এসে দেখা করলো পৃথ্বীশের সঙ্গে। সে আশা করেছিলো, পৃথ্বীশ তাকে শ্যামলিম সিন্‌হার কোন খবর দেবে। কাজেই অধীর আগ্রহের সঙ্গেই সে ছুটে এসেছে। শ্যামলিমর কোনরকম খোঁজতল্লাস সে বহুত চেষ্টা ক'রেও কিছু বের করতে পারেনি।

নিচে বসবার ঘরে অলকা অপেক্ষা করছিলো। এই ঘরে অলকা বহুকাল ঢোকেনি। কারণ নভসির সঙ্গে দেখা করতে এলে সে সরাসরি দোতলায় তার ঘরে উঠে যায়। ব'সে-ব'সে অলকা ঘরের সাজসজ্জা পর্যালোচনা করছিলো। 'ঐশ্বর্যের স্থূলতার মধ্যে রুচি একেবারেই চাপা পড়েনি যা হোক'—অলকা নিজের মনের খাতায় এই মন্তব্যটি লিখলো। 'সম্ভবত নভসিই সাজিয়েছে ঘরখানা'—অলকা মনে-মনে বললো, 'নয়তো পাটকিলে রঙটার এত বাড়াবাড়ি দেখতাম না। বেশীর ভাগ জিনিসই ঐ রঙের। পর্দা, কুশন, চেয়ারের পিঠের ঢাকনা, সোফাগুলো, টেবলক্লথ—মায় টেবিলে চায়ের কাপ রাখবার জন্যে যে রবারের টাম্বলার-রেস্ট তাও খুঁজে-পেতে ঐ রঙের। শিল্পরুচির নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে অবিশ্যি এই সাম্যের বাড়াবাড়ি বা খুঁতখুঁতে মনোভাব মনের আভিজাত্যই সূচিত করে, তবুও কোথায় যেন একটু কিন্তু থেকে যায় না?'

এ-প্রশ্নের মীমাংসার আগেই পৃথ্বীশ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো।

পোশাকী ভদ্রতার কায়দামাফিক সে করজোড়ে নমস্কারের একটা ইঙ্গিত দিয়ে হাসিমুখে বললো, 'এই যে অলকাদি, ভালো আছেন তো? মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'কই না তো।'

'সে কী, আমি যে খবর পাঠালাম মাকে আগে সব বলতে আপনাকে। না এই চাকরটাকে দিয়ে আমার পোষাবে না, একটা কাজও—যাকগে। খুকীর খবর জানেন না তো, না?'

'খুকী? ও, নভসি? কেন, কী হয়েছে তার?'

'কিছুই জানেন না?'

অলকা ঘাবড়ে গেলো। বেশ ভীত গলায় বললো, 'না তো। কী হয়েছে?'

'হিস্টিরিয়া। প্রায়ই ফিট হয়ে যায়। ডাক্তারের ওপীনিয়ন, মেণ্টাল রিলীফ দিতে না পারলে পাগল হয়ে যাবার এভ্রি পসিবিলিটি। ইট সীম্স্, শি ইজ ইনক্লাইন্ড্ টু সাম্বডি। কে সে তা ও কিছুই বলছে না। ইয়েট, উই শুড্ নো ইট! তা আপনি কি কিছু বলতে পারেন এ বিষয়ে?'

অলকা হতভম্ব হয়ে রইলো।

পৃথ্বীশ হাতঘড়ি দেখলো অধৈর্য দেখিয়ে। বোঝাতে চাইলো তার হাতে সময় কম।

'সে কী, এই মাস তিনেক আগেও তো ওকে দিব্যি ভালোমানুষটি দেখে গেলাম। এর মধ্যে এত কাণ্ড কবে হ'লো। হ্যাঁ, একটি ছেলেকে ও পছন্দ করে সে-খবর অবিশ্যি জানি আমি। মানে মাস তিনেক আগেও করত। পরের খবর অবিশ্যি জানি না। তা তাকে তোমরাও হয়তো চিনবে। প্রভাত।'

'কে প্রভাত?'

'প্রভাত বোস। ঐ যে, গান গায়। মনে নেই, কয়েক বছর আগে নভসিকে গান শেখাত। কেন, তার তো নিয়মিতই আসা-যাওয়া আছে এ বাড়িতে।'

পৃথ্বীশ চিনতে পেরেছে, কিন্তু সে স্তম্ভিত। খুকী শেষ পর্যন্ত প্রভাতের মতো একটা সাধারণ, একটা 'ক্যাড', একটা 'নামগোত্রহীন' ছোকরার জন্যে মাথা খারাপ করবে, এই সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গেসঙ্গে তার নিজেরও যে মাথা খারাপ হবার যোগাড়! উত্তেজনায় সে তার ড্রেসিং গাউনের একটা বোতাম পাকাতে পাকাতে ছিঁড়েই ফেললো।

'নভসি আছে বাড়িতে?'—অলকা সভয়ে জিগ্যেস করলো।

পৃথ্বীশ চোখমুখের মুদ্রায় বুঝিয়ে দিলো ওপরে আছে।

'আচ্ছা একটু দেখা ক'রে আসি'—ব'লেই অলকা উঠলো। কিন্তু, শ্যামলিমর কথা তো এ কিছুই বললে না? দ্বিধা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলো, 'আচ্ছা শ্যামলিম সিন্‌হার কোন খবর বলতে পারো? অফিসে আসে সে রোজ?'

'কে সে?'—পৃথ্বীশ ভুরু কোঁচকালো।

'শ্যামলিম? তোমাদের কোলিগ তো। অফিসার। তোমাদের অফিসেরই তো, এক অফিসার। চেনো না?'

'সিন্‌হা? শ্যামলিম, মানে এস. সিন্‌হা? কৈ না। এ নামে তো আমাদের ওখানে কোন অফিসার আছে ব'লে জানি না। কেন, কী ব্যাপার?'

অলকার মুখ ফেকাশে হয়ে গিয়েছিলো। সে আর কথা না বাড়িয়ে বেসুরো গলায় বললো, 'না থাক, চেনো না যখন তখন আর কী হবে। আচ্ছা আমি আসি ওপর থেকে।'

ওপরে এসে কিন্তু অলকা নভসিকে ঘরে পেলে না।

বাচ্চা চাকর পান্নু বললো, 'দিদি চিলাকোঠায়।'

'চল তো আমার সঙ্গে।'

পান্নুকে নিয়ে অলকা চিলেকোঠায় উঠে এলো।

'এখানে শুয়ে আছো যে?'

নভসি উঠে ব'সে হাসলো।

'শ্রাবণ মাসের রৌদ্র এমন কিছু তো আরামপ্রদ না বাছা। এই ছেলে, দরজাটা বন্ধ ক'রে দে তো। তুমি ঐ জানলা বন্ধ করো বাপু। রোদের মধ্যে পুড়ছিলে, হুঁস নেই একটু!'

পান্নু ছাদের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিচে নেমে গেলো। নভসি পুবের জানালাটা বন্ধ করলো।

'কী ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি? চোখমুখের এমন ছিরি হয়েছে কেন?'

'আজ আপনার অফিস নেই? সকালে এলেন যে?'

'রোজ রোজ আর কাঁহাতক আপিস ভাল লাগে বলো। আপিসটা ছাড়তে পারলে বাঁচতাম। বছরের পর বছর ধ'রে ঐ একই চেয়ার একই চেয়ার, ঘেন্না ধ'রে গেলো। তা তোমার খবর কী বলো। প্রভাতের খবর বলো।'

নভসির মুখের সমস্ত কোমলতা সঙ্গেসঙ্গে রুক্ষ পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেলো।

মুখের এই পরিবর্তনে ইতিহাসের কোন্ পরিবর্তন সূচিত করে তা বুঝতে অলকাতিলকা রায়ের অসুবিধে হয় না। অনেক সে দেখেছে, অনেক জেনেছে!

তাছাড়া পৃথ্বীশ ওর যে-রোগের কথা বললো তাই যদি হয়ে থাকে, তাহ'লে, সে ভালোই জানে, ঐ মুখে অমনি কালো রঙ যদি বেশীক্ষণ থাকতে দেওয়া হয় তাহ'লে ও ফিট হয়ে যাবে, একটা কেলেঙ্কারির মধ্যে পড়তে হবে। অলকা

নভসির চোখের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলো। নভসির মুখের আকৃতিটাই যেন কেমন একটু বদলে গেছে, অলকার মনে হ'লো। কিন্তু এ প্রসঙ্গ বদলে অন্য কোন কথা কিছুই সে হাতড়ে পেলে না। কী প্রতিক্রিয়া হবে কিছুই না বুঝে যে-কথাটা তার মুখে আপনাআপনি বেরিয়ে গেলো : 'আমি না, আজকে আসলে তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। শ্যামলিমর খোঁজে'—সেই কথাটাকেই সে বিস্তৃত করা শুরু করলো, 'লোকটার কোন পাত্তা না পেয়ে পেয়ে আমার এমন অস্বস্তি হচ্ছিলো যে আর থাকতে না পেরে ছুটে এলাম। তা শুনলাম ও নামে কোন লোককে সে চেনে না। কী ক'রে চিনবে! আমারও মনে হচ্ছিলো লোকটা আসলে ধাপ্পাবাজ। নামটাও হয়তো বানানো! হ্যাঁ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। ও যে আগাগোড়াই আমাকে ঠকিয়েছে, তার আরো অনেক প্রমাণ আমি—ও কী নর্ভাস, এই, এই নভসি!'

নভসি ভয়ানকভাবে হাসতে শুরু করেছে। চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে তার, প্রচণ্ড এক হাসির বন্যা যেন সহসা ওর শরীরের সমস্ত বাঁধ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সর্বনাশা বেগে ছুটে আসছে, হাসতে হাসতে হাত-পা ছুঁড়ে নভসি একবার এপাশে একবার ওপাশে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

অলকা আতঙ্কে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো সিঁড়ির কাছে স'রে এসে, 'পানু পানু!'

পানুর আগে বুড়ী মোক্ষদা এক মগ জল আর হাতপাখা নিয়ে উঠে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে।

নভসি ততক্ষণে দু-হাত মুঠি পাকিয়ে দাঁতে-দাঁত লাগিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।

১৩

গুমোট গরম পড়েছে।

অনন্ত শূন্যের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে নভসি জানালায় ব'সে ছিলো একা। সন্ধে গড়িয়ে গেছে। মোক্ষদা এসে সুইচ টিপে আলো জেলে রেডিও খুলে দিয়েছিলো। দিয়ে বেরিয়ে যেতেই নভসি আলো নিবিয়ে রেডিও বন্ধ ক'রে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। এই আবছা অন্ধকারের মধ্যে তবু টে'কা যায়, কিন্তু আলো জাললে সমস্ত শরীর বিষিয়ে ওঠে। টেবিল-ফ্যান অবিশ্যি আছে, কিন্তু আর ভাল লাগে না ঐ যান্ত্রিক হাওয়া। আজ সমস্ত দিনই ঐ হাওয়া খেয়ে খেয়ে নভসির বিরক্তি ধ'রে গেছে। আজ সে বাড়ি ছেড়ে এক পাও বেরোয়নি। মা অবিশ্যি বলেছিলেন বিকেলে কোথাও একটু ঘুরে আসতে। কিন্তু তার ইচ্ছে হয়নি। আজ বেশির ভাগ সময়ই সে কাটিয়েছে মায়ের ঘরে, অবিশ্যি যখন-যখন বাবা ছিলেন না। দুপুরবেলা সে মায়ের কোলে শুয়েই ঘুমনোর চেষ্টা করেছিলো কিন্তু ঘুম আসেনি। মা তার মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার ছোটবেলার দুষ্টুমির গল্প ব'লে ব'লে তার ঘুম আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নভসির ঘুম আসেনি।

নভসি হিসেব ক'রে দেখলো, প্রভাতের সঙ্গে সেই ঝগড়া ক'রে চলে আসার পরে আজ পনেরো দিন যাচ্ছে। এর মধ্যে সে একবারও এলো না! এই চিন্তাটাই তার কাছে সবচেয়ে অসহ্য লাগে। এই চিন্তাটা যে, সে যাকে আপনার ক'রে পেতে চায় সে তাকে চায় না! যেটা তার ধারণা ছিলো অবিশ্বাস্য, অসম্ভব। সেই ছেলেবেলা থেকে সে দেখে আসছে যে তাকে সবাই ভালোবাসে; সবাই অন্তরঙ্গ ক'রে পেতে চায়। বিশেষত ছেলেরা। তার একটু হাসি, একটু দাক্ষিণ্য পেলে যে-কোন ছেলে মনে হয়েছে যেন বর্তে গিয়েছে। এই পাওনাটা তার এমনি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো এবং এই স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা তার এমনি সুলভ, অনিবার্য, অনায়াস পাওনা ব'লে মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে প্রভাতের আচরণ তার সমস্ত ধারণা, বিশ্বাস আর সংস্কারের মূলে মারাত্মক আঘাত করেছে।

শেষের সেই সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত নভসি প্রভাতের এড়িয়ে এড়িয়ে চলার

অন্তরকম অর্থ খুঁজে বের করতে পেরেছিলো। তখনও প্রভাতের উদাসীনতায় তার রাগ হত, উত্তেজনা হত, অসহ্য লাগত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, চিঠি লিখলেই, প্রভাত এসেছে, কথা বলেছে—এবং প্রভাতের চোখের দিকে তাকিয়ে নভসি আশ্বস্ত হয়েছে। ছেলেদের চোখের যে-দৃষ্টি দেখতে সে অভ্যস্ত সেই দৃষ্টি সে প্রভাতের চোখেও দেখতে পেয়েছে। এবং তখনই তার মনের সব গ্লানি কেটে গেছে।

কিন্তু সেদিন, কত আশা ক'রে, কত বিপদ আর দুর্নামের ঝুঁকি নিয়ে ওর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে নেয়নি। সেদিন প্রভাতের চোখে প্রত্যাখ্যানের চিহ্ন, ভয়ের চিহ্ন, অবিশ্বাসের চিহ্ন কী বিশ্রীভাবেই না ফুটে উঠেছিলো! ভাবতে ভাবতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলো। সেদিন নভসি প্রভাতের মধ্যে এক দুঃসাহসী পুরুষকে আশা করেছিলো—যে ডাকাতের মতো লুট ক'রে নেবে তার যৌবন, তার সব কিছু। কিন্তু কাপুরুষের মতো প্রভাত পিছিয়ে গেছে! যে মুহূর্তে নভসি প্রভাতকে তার সব কিছু দিয়ে দেবার জন্যে খোলা আকাশের নিচে সমুদ্রের মতো উদ্বেল হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তেই প্রভাত ভূমিত্রীর নাম উচ্চারণ ক'রে তার সমস্ত মর্যাদা সমস্ত স্বপ্নকে অসম্মানের অপরিমেয় গ্লানির বোঝায় ভারাক্রান্ত ক'রে দিয়েছিলো!

গতকাল পর্যন্তও নভসি তার এই সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলো যে প্রভাতের সঙ্গে তার জীবনের সমস্ত অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। অলকাদির মতোই, এখন সে দ্বিতীয় পুরুষের সন্ধান করবে এমনি পরিকল্পনাও মনের মধ্যে নিতে চাচ্ছিলো। কিন্তু কেবলই যেন তখন মনে হয়েছে তার সমস্ত দেহমন অপবিত্র অসম্মানিত হয়েছে। এই কলঙ্কের জঞ্জাল নিয়ে তার পক্ষে আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, এই দুর্বহ বোঝা আর বেশী দিন বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব। এবং আজ সকাল থেকেই তার কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে, আর একখানা চিঠি লিখে সে প্রভাতকে শেষবারের মতো ডেকে পাঠায়, তার সঙ্গে বোঝাপড়া যা হবার হয়েই গেছে, তবুও আর একবার। একটি প্রশ্ন সে শুধু করবে প্রভাতকে, শুধু একটি প্রশ্ন।

কিন্তু কী সেই প্রশ্ন?

শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে নভসি দুঃখে অভিমানে কানায় কানায় ভরে উঠতে লাগলো।

ইতিমধ্যে দরজার বাইরে মোক্ষদার ডাক শোনা গেছে, সে সাড়া দেয়নি। মোক্ষদা ডেকে-ডেকে ফিরে গেছে। তারপর মা এসেছিলেন। সে তখনও দরজা খোলেনি, ব'লে দিয়েছে সে এখন একটু একা থাকতে চায়।

কিন্তু এবার অন্য কেউ। মোক্ষদা নয়, মা নয়। তারা এভাবে দরজায়

টোকা দেয় না। এ একমাত্র দাদা হতে পারে, নয়তো এ-বাড়ির কেউ নয়।

আলো জ্বেলে নভসি দরজা খুললো।

পৃথ্বীশ প্রবেশ করলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পৃথ্বীশ একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। তার মুখ ভীষণ গম্ভীর। নভসিকে সে বসবার ইঙ্গিত করলো।

নভসি দাদার রকমসকম দেখে তাজ্জব ব'নে গেছে। চিরকালই ও একটু গম্ভীর প্রকৃতির, তা ঠিকই, কিন্তু তাই ব'লে সে আমার কাছে এমনি জল্লাদের মতো মুখ নিয়ে এসে বসবে এ সত্যিই ভাবতে পারতাম না—নভসি মনে-মনে বললো। ঠোঁট কামড়ে ধ'রে সেও বসলো একটা চেয়ার টেনে।

'তোমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করব। উত্তর চাই।'

নভসির চোখ টাটিয়ে উঠলো। তবুও সে স্থির অবিচল হয়ে থাকবার চেষ্টা করলো দাদার চোখে চোখ রেখে।

'বাবা বছরে কত টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেন তা জানো?'

নভসি অবাক। বললো, 'না!'

'আড়াই হাজার টাকা।'

একটু থেমে পৃথ্বীশ ফের জিগ্যেস করলো, এবার তার গলার ধার আরো বেশি, 'বুঝতে পেরেছ?'

নভসি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। বললো, 'না! আড়াই হাজার তো, তার আবার বোঝার কী আছে?'

'বোঝার কী আছে তার জন্য তোমাকে যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হয়েছে!'

'খুব যে লম্বা লম্বা কথা বলছ! ব্যাপার কী!'

'প্রভাত বোস পুরো এক বছরে যা মাইনে পায় তাতেও কি আড়াই হাজার টাকায় পৌঁছয়?'

নভসি হাঁপ ছেড়ে বললো, 'ওঃ! এই বলতে এত ভণিতা!'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'না, দেব না!'—নভসিও উদ্ধত গলায় বললো।

'খুকী!'—পৃথ্বীশ চিৎকার ক'রে ধমকে উঠলো।

'তোমার ঐ চোখরাঙানিতে আমি ভয় পাইনে! বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে'—নভসিও চিৎকার ক'রে উঠলো।

এবং সেই চিৎকারের সঙ্গেসঙ্গেই সে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়লো।

গভীর রাত্রে নভসির ঘুম ভেঙে গেলো।

আজ মা শুয়েছেন পাশে। আলতোভাবে নভসি মাকে স্পর্শ করলো। মা'র ঘুম খুব পাতলা, একটুতেই জেগে যান ভেবে নভসি হাত টেনে নিলো। না থাক, হয়তো একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, জাগিয়ে দিলে হয়তো সারা রাত আর ঘুমোতে পারবেন না।

মেঝেতে মোক্ষদা ঘুমোচ্ছে না চুপ ক'রে শুয়ে আছে কে জানে।

একটু ছাদে যেতে ইচ্ছে করছে। হ্যাঁ, খোলা হাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে একটু দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। এত রাত্রে একা ছাদে যাব ভেবে একটুও তো ভয় করছে না আজ। কী আশ্চর্য। যাব আর চ'লে আসব। বেশীক্ষণ থাকব না। বেশীক্ষণ থাকলে আমার ভয় করবে। মা বকবে মোক্ষদা বকবে।

এই তো আমি ঘরের বাইরে চ'লে এসেছি। কেউ টের পায়নি। টের পেলে কি ছাই আসতে দিত। সবাই হুলস্থূল লাগিয়ে দিত। মা কাঁদতে বসতেন। মোক্ষদা চেঁচাতে শুরু করত। পানুটা ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে থাকত। রোদসীরা খুব কাঁদছে। কাঁদছে কেন? কী আশ্চর্য। তার ছোট ছোট ভাইবোনগুলি সবাই সমস্বরে কান্না জুড়ে দিয়েছে কেন? উঃ বুকের মধ্যে কী যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। গলার কাছে কী যেন আটকে আছে। নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। খোলা আকাশ আর খোলা হাওয়ায় যেতে না পারলে দমবন্ধ হয়েই মারা যাব যে? হে ভগবান! কিন্তু ওদের কান্না না থামলে কী ক'রে যাই।

কই? কেউ কাঁদছে না তো! সব ভুল! কাঁদবে কেন! সবাই ঘুমোচ্ছে বেঘোরে। আমার যত পাগলামি। ওঃ এতক্ষণে ছাদে চ'লে যাওয়া যেত। সিঁড়ির গোড়াতেই কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি ভূতের মতো তার ঠিকঠিকানা নেই!

উঃ সিঁড়িগুলি আর ফুরোবে না যেন। ছাদে উঠতে এত সিঁড়ি? এত সিঁড়ি তো আগে ছিলো না? এ-সব সিঁড়ি কবে থেকে হ'লো? এত উঁচু উঁচু বিশ্রী সিঁড়ি আগে একটাও ছিলো না। হোক বিশ্রী, না ফুরোক, আমি উঠবই। তাতে দম ফুরিয়ে যাক, নিঃশ্বাস আটকে যাক, গড়িয়ে প'ড়ে ম'রে যাই—তবুও উঠব। মরার পরেও উঠব! ভাবতেই নভসির প্রচণ্ড হাসি পেলো।

না, না, না, এখন হাসতে শুরু করলে আর সিঁড়ি ভাঙা যাবে না। যত হাসি তত কান্না! কিন্তু সিঁড়ি যে তার চাইতেও বেশি! এই কথাটা ভাবতেই নভসির সমস্ত শরীরের মধ্যে হাসির আর একটা ঢল নামলো। এবার আর হাসি সামলানো তার পক্ষে অসম্ভব হ'লো।

হাসতে-হাসতেই সে প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। কিন্তু কই? আর সিঁড়ি কই? তাহ'লে তো আমি পৌঁছে গেছি। ঐ তো আকাশ। এই তো বুকভরা হাওয়া। উঃ হাসির স্রোতটা নেমে গেছে। একটু দম ফেলতে পারছি এখন। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে নাকি? পড়ুক আমি তো তাইই চাই। বুকভরা শান্তি। উদার আকাশ উদার হাওয়া উদার বৃষ্টি! ব্যস, জীবনে আর চাই কী! সব পাওনাই মিটে গেলো। সব তৃষ্ণার শান্তি। মুক্তি! অবিশ্যি মাকে নিয়েই মুশকিল। বড্ড কান্নাকাটি করেন। আর ছোট ছোট ভাইবোনগুলি। আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে ওরাই। আর মোক্ষদা। মোক্ষদার মতো মানুষ হয় না। মোক্ষদা কি জেগে গেছে? মোক্ষদার ছোট ছেলেটা যেবার কলেরায় মারা গেলো মোক্ষদার কী কান্না। নভসির দম ফেটে কান্না পেলো। কান্নার বেগ সামলাতে সে ছাদের আলিসার ওপর গিয়ে পড়লো মুখ থুবড়ে।

সঙ্গেসঙ্গে কেটে গেলো মুখ। জিভ দিয়ে নভসি রক্তের আস্বাদ নিতে লাগলো।

কেটে গিয়ে ভালো হয়েছে। তবু একটু দম নিতে পারছি।

কিন্তু আবার ঠেলে আসছে কান্নার বেগ। পাঁজরার সমস্ত হাড় গুঁড়িয়ে, গলা টিপে ধরবার জন্যে এ কোন্ ডাইনীবুড়ী আমার দিকে এগিয়ে আসছে? ওঃ মাগো, আমি আর পারি না, চিৎকার ক'রে উঠে নভসি আলিসাটার ওপর শুয়ে পড়লো, সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে সে আলিসাটা বেড় দিয়ে আঁকড়ে ধরবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। জ্ঞান হারাবার সঙ্গেসঙ্গে নভসি গড়িয়ে নিচে প'ড়ে গেলো।

এর খানিক পরেই খুব ঝোঁকে বৃষ্টি নেমেছিলো।

নভসির বীভৎস মৃতদেহ ভোরবেলা প্রথম আবিষ্কার করেছিলো রাস্তার কয়েকটা ঘেয়ো কুকুর।

১৪

ছুটি ফুরিয়ে গেলো দেখতে দেখতে। আজই শেষ দিন। প্রভাত ভাবছিলো। বালিশে মুখ গুঁজে। এত আলস্য আর অবসাদ! বিছানা ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। শেষ রাতের দিকে যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামলো, সেই বৃষ্টির একটানা ঝমঝমানি শুনতে শুনতে ঘুম এসে গিয়েছিলো। এখন বৃষ্টি নেই মনে হচ্ছে, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্যের নামগন্ধও নেই। রেডিওতে বাংলা খবর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মা সেই ঘণ্টাখানেক ধ'রে চেঁচাচ্ছেন: 'এই প্রভাত উঠবি না? আটটা বেজে গেলো যে।' মার এই পদ্ধতিটি বেশ। প্রভাত মনে-মনে হাসলো। সেই কোন্ সকাল থেকে সবাইকে ঘুম থেকে তোলার জন্যে চেঁচিয়েই চলেছেন: আটটা বাজে! বেজে গেলো! সবাই উঠে পড়েছে। সে-ই এখনো গড়াচ্ছে।

জীবনটাকে বড়ো মিইয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে। বড়ো কাজ তো দূরের কথা, সাধারণ দায়িত্বের কাজেও কেমন যেন উৎসাহ পাই না! অফিসের সহকর্মীরা জোরজবরদস্তি ক'রে এবছর তাকে অফিসের সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সাহিত্য-সম্পাদক নির্বাচিত করেছে, তার নামের জোরে ঐ পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি—যদিও এটা সুবিদিত ছিলো সে না দাঁড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত। এই সার্বজনিক প্রীতি-লাভের সৌভাগ্য আমার আছে, কিন্তু তার মূল্য দেবার শক্তি আমার কই। গ্লানির ভারে আমি নত। জীবনের ভার বহন ক'রে চলেছি একটা নির্বোধ পশুর মতো। আগ্রহ, আসক্তি, প্রেমের যে নিবিড় অনুভব—তা থেকে আমার মন পরিত্যক্ত হয়েছে। আগে কোন একটা গানের সুর নিয়ে আমার সমস্ত সত্তায় সমুদ্রের আবেগ জমত, সমস্ত দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত সেই সুরের রহস্য সন্ধানে তা টেরই পেতাম না। কিন্তু কোথায় গেলো সেই সব সুর আর গান! মানুষের মনের কথা আর নিজের কথা লিখতে বসলে এই কিছুকাল আগেও কী উন্মাদনাই লাগত। কিন্তু অতর্কিতে কোথা থেকে যেন এক দারুণ অভিশাপে আমার সমস্ত সত্তা বিষিয়ে গেলো। মনের স্বর্গ থেকে পরিত্যক্ত নির্বাসিত হয়ে আমি এ কী নরকের অন্ধকারে পচে মরছি! আশাহত, নীতিভ্রষ্ট, অবিশ্বাসে সমস্ত মন ক্লেদাক্ত।

'আপনার মধ্যে বিশ্বাস জিনিসটাই নেই!' নভসি একদিন বলেছিলো। কথাটা নির্মমভাবে সত্য। আজ একবার গেলে হত ওর কাছে। আর ও চিঠি লিখবে না। ঐ ঘটনার পরে নিশ্চয়ই তার মনের বদল ঘটেছে। ঘটেছে? বড়ো জানতে ইচ্ছে হয়। এই এক আশ্চর্য মেয়ে! সরল, শিশুর মতো। মনে হয় যেন শিশুর মতোই নিষ্পাপ। কিন্তু জীবনের পথ যদি শুধু আবেগ আর অনুরাগের মধ্যেই তৈরী হত তাহ'লে আর কথা ছিলো কি! আবেগ আর অনুরাগ বড়ো জোর মাথার ওপরকার আকাশ। হ্যাঁ, সেদিক থেকে ওর স্বভাবের সঙ্গে ওর নামের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। সেই আকাশের তলায় আমি দাঁড়িয়েছি। আমার বুক ভরে গেছে, মনে রোমাঞ্চ লেগেছে। কিন্তু অত সহজ অত সরল আকাশ আমার জন্যে আমার নিয়তি নির্দেশ করেনি। আমি বেশীক্ষণ কেন যেন সহ্য করতে পারিনে সেই স্বর্গ, সেই নির্ভার আনন্দ। যেখানে দুঃখ নেই গ্লানি নেই সমস্যা নেই তা আমার জন্যে নয়। সুখের কোলাহলে আমার শান্তি বিঘ্নিত হয়, সুখ আমার কাছে বিরক্তিকর—আমার বিশ্রাম আমার আসন দুঃখের পাঁকের মধ্যে, যন্ত্রণার আগুনের মধ্যে।

আবার লিখতে শুরু করব? আমার বন্ধুরা সবাই আমার উপর বিরক্ত। আমি লিখতে শুরু করলে তারা খুশী হবে। কিন্তু বড়ো ভয় হয়, আমি যদি নিজেকেই খুশী করতে না পারি? আমার নিজের কাছে এখনো আমার মর্যাদা আছে, মূল্য আছে—কিন্তু যদি প্রমাণ হয়ে যায় সে মূল্য আমার পাওনা নয়! আত্মমর্যাদার সেই শেষ অবলম্বন যদি আমার তলিয়ে যায় গ্লানির অনন্ত নরকে, তাহ'লে?

'দাদা, তোমাকে ডাকছে বাইরে'—ভিক্ষু এসে বললো।

'কে?'

'কিজানি, কখনো দেখিনি আগে।'

'নাম জিগ্যেস কর।'

'বা-বা! ভদ্রলোককে নাম জিগ্যেস করা যায়?'

প্রভাত হাসিমুখে এবার উঠে বসলো। 'ভদ্রলোককে নাম জিগ্যেস করা যায়? সত্যিই তো।'

ভিক্ষু ততক্ষণে পালিয়েছে লজ্জা পেয়ে। ভিক্ষুর বয়স পনেরো, শান্তিদেবের কনিষ্ঠা কন্যা।

গায়ে গেঞ্জিটা গলিয়ে নিয়ে প্রভাত বাইরে এসেই চমকে উঠলো।

'আরে অমর যে। কী সৌভাগ্য অ্যাঁ। এই সাতসকালে কী মনে ক'রে? এসো এসো। কিন্তু তোমার হয়েছে কী? এর'ম চেহারা কেন?'

'নিচে চলো। কথা আছে। জামাটা গায়ে দিয়ে এসো।'

অমরের ভাবভঙ্গী মুখের চেহারা দেখে প্রভাত স্তম্ভিত। অমর অবিশ্যি চড়া মেজাজের ছেলে, বেহালা বাজাতেও যেমনি ওস্তাদ রাস্তাঘাটে একে-ওকে হক-না-হক কারণে পিটতেও তেমনি ওস্তাদ, কিন্তু প্রভাতের জন্যে অমরের মন সর্বদাই কোমল সুরে বাঁধা। প্রভাত অমরের কাছ থেকে তেমনি ব্যবহারেই অভ্যস্ত। কিন্তু আজ এ কী চোয়াড়ে মনোভাব নিয়ে ও এসে উপস্থিত! কথাটা ব'লেই ও মুখ ফিরিয়ে স'রে গিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে। কী ব্যাপার, মারবে না কি রে বাবা! হতভম্ব মুখে প্রভাত চোখেমুখে একটু জল ছিটিয়ে, মুখ মুছে, গায়ে জামাটা চড়িয়ে চ'লে এলো।

রাস্তায় নেমে অমর বললো, 'ভালোই আছো তাহ'লে!'

'কী ব্যাপার!'—প্রভাত আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারলো না, 'তোমার হয়েছে কী! এভাবে কথা বলছো!'

'আমি জানতুম না প্রভাত যে তুমি এত বড়ো বিশ্বাসঘাতক।'—অমর চরম ঘৃণায় বললো।

'কী, হয়েছে কী বলবে তো আগে! আগেই যে গালাগাল শুরু ক'রে দিলে!'

'নিতান্ত তুমি ব'লেই বেঁচে গেলে। অন্য কেউ হ'লে হয়তো আমি এর উপযুক্ত প্রতিশোধ না নিয়ে পারতাম না।'

'আমার প্রতি তোমার এত দয়ার কারণ কী সেটাও জানাও এবং প্রতিশোধ কী কারণে সেটাও না হয় একটু জানালে!'

'কেন এত ন্যাকা সাজছ বলো দেখি!'

'অমর, আমার সহ্যের সীমা আছে!'—প্রভাত এবার ফুঁসে উঠলো।

'নভসির মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী?'—অমরের চোখদুটো জ্বলছিলো বাঘের মতো।

প্রভাত ভয়ানকভাবে চমকে উঠেছে।

'কী? কী বললে? নভসির কী বললে?'

'মৃত্যু!'

প্রভাত নিশ্চল হয়ে গিয়েছিলো সঙ্গেসঙ্গে।

'তার মানে?'

'তার মানে আমি তোমাকেই জিগ্যেস করতে এলাম!'

এত বড়ো দুঃসংবাদের জন্যে প্রভাত প্রস্তুত ছিলো না। উত্তেজনার প্রচণ্ড আঘাতে সে স্তব্ধ হয়ে গেলো। আর একটিও কথা না ব'লে সে চলতে লাগলো।

‘কোন্ দিকে চলেছো ?’—কিছুক্ষণ পরে অমর জিগ্যেস করলো।

‘চলো কোথাও গিয়ে বসি।’

‘চায়ের দোকানে যাবে ?’—অমর জিগ্যেস করলো। নভসির মৃত্যুসংবাদে প্রভাতের প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ দেখে অমরের উত্তেজনা সহসা শিথিল, এলোমেলো হয়ে গেছে। অনেক নরম হয়ে গেছে সে।

‘না। চলো কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসি।’

আকাশে জমাট মেঘ। হাওয়া নেই একফোঁটা। সকালবেলাকার আপিস-কাচারির সময় এখন, মহানগরীর রাজপথ এখন উর্দ্ধশ্বাস। রাস্তার ভিড় কাটিয়ে দুজনে কলেজ স্কোয়ারে জলের সামনে বাঁধানো চত্বরের ওপর বসলো।

ভাবপ্রবণ অমর বেশীক্ষণ নীরব থাকতে পারলো না। আর্ত ভগ্নকণ্ঠে সে অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে নভসির সম্পর্কে নানান কথা বলতে লাগলো। তার সেই স্বগত সংলাপের মধ্যে নভসির বীভৎস মৃত্যুর কাহিনীও ছাড়াছাড়াভাবে বিবৃত হ'লো। এবং সেই সঙ্গে অমরের গলায় আরো যেটা ধ্বনিত হ'লো সে হচ্ছে প্রচণ্ড ক্ষোভ—কেন প্রভাত নভসির জীবনে এই সর্বনাশ নিয়ে এলো।

প্রভাত হতবাক হয়ে শুনেই গেলো সব। কোন প্রতিবাদ, শোকসূচক একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

‘এ-ঘটনা কবে ঘটলো ?’—অনেকক্ষণ পরে প্রভাত জিগ্যেস করলো।

‘গতকাল। ছাদ থেকেই লাফিয়েছিলো বোঝা যায়। কত রাত্রে কে জানে। বাড়ির কেউ আগে টেরও পায়নি।’

অমর নভসির খুড়তুত ভাই। এবং এই অমরই একদা প্রভাতকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো নভসিকে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়ে দেবার জন্যে। অমরের উদ্যোগেই নভসির সঙ্গে প্রভাতের আলাপ।

দু-এক ফোঁটা ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিলো খানিকক্ষণ থেকেই। বৃষ্টিটা বাড়তেই অমর উঠে পড়লো, প্রভাতকেও হ্যাঁচকা টান মেরে তুললো। একটা ছাউনির তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। বেঞ্চির ওপর একটা ঘেয়ো কুকুর ঘুমোচ্ছিলো। সেটাকে অমর লাথি মেরে ঠেলে ফেলে দিলো। কুকুরটা আতঙ্কে আর্তনাদ ক'রে ছুটে পালালো।

তারপর সেই বেঞ্চিতে দুজনে পাশাপাশি ব'সে রইলো। অমর একটার পর একটা বিড়ি শেষ করতে লাগলো। প্রভাত জড়, পঙ্গু, ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো ধুঁকতে লাগলো।

বৃষ্টি হচ্ছিলো মুষলধারে। ছাউনির নিচে ব'সেও দুজনে সম্পূর্ণ ভিজে গেলো।

বৃষ্টি ক্রমে যখন ক'মে এলো, অমর হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললো, 'চলো উঠি। ভিজে তো গেছিই, আর ব'সে থেকে কী হবে।'

প্রভাত না উঠে জিগ্যেস করলো, 'কোথায় যাবে এখন ?'

'নভসিদের বাড়িতেই যাব। নভসির মা'র অবস্থা কাহিল। থেকে-থেকে ফিট হয়ে যাচ্ছেন সেই কাল থেকে। এক ঝি আছে, মোক্ষদা, সে-বুড়ীর অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন-বা ওরই মেয়ে মারা গেছে। আর ছোটগুলি তো আছেই। কে কাকে সামলায় তার ঠিক নেই। আমাকে এখন কিছুকাল ঐ-বাড়িতেই কাটাতে হবে। আমারই তো দোষ, আমারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!'

'আচ্ছা তুমি যাও, আমি পরে যাব।'

অমর ভ্রূক্ষেপ না ক'রে হনহনিয়ে চলে গেলো।

প্রভাত ব'সে রইলো ভূতের মতো।

আহারে রুচি ছিলো না। ক্ষুধা তৃষ্ণা লোপ পেয়েছে একরকম। বাড়িতে এসে বলেছিলো, এক বন্ধুর বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে। ঠাকুমা সুনয়নী অবিশ্যি সহজে ছাড়েননি। প্রভাতের চোখমুখের চেহারা দেখে বকাবকি শুরু ক'রে দিয়েছিলেন, বৃষ্টিতে সে ভিজে এসেছে ব'লে বহুক্ষণ যাবৎ আপন মনেই গজগজ করেছেন এবং প্রভাতের বিরক্তি গ্রাহ্য না ক'রে তার কপালে-বুকে পিঠে বারংবার হাত দিয়ে-দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন প্রভাতের জ্বর এসেছে কিনা।

জ্বর না এলেও সমস্ত শরীরে প্রভাত অসহ্য বেদনা আর দুর্বলতা বোধ করছিলো। সন্ধে পর্যন্ত কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিলো। ভাবছিলো আজই ছুটি শেষ হ'লো, কালকে থেকেই আবার অফিসের ঘানি। অথচ শরীরের এই অবস্থা নিয়ে কালকে অফিস যাবার কথা ভাবতেও তার ভয় হ'লো। একমাত্র উপায় ডাক্তারের কাছ থেকে সিক-সার্টিফিকেট পাঠানো। কিন্তু এখন ডাকে 'এক্সপ্রেস ডেলিভারি' ফি দিয়ে পাঠালেও সেটা কালকে যদি অফিসে ঠিকমতো না পৌছয় ? একমাত্র উপায় ভূমিত্রী। তার হাত দিয়ে সিক-সার্টিফিকেটটি পাঠালে চিন্তার কিছু থাকে না। ঠিক জায়গায় ঠিক লোকের কাছে সে সেটা জমা দিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু ভূমিত্রীও তো চ'টে আছে। ছুটির মধ্যে আর একদিন যেতে বলেছিলো। যাওয়া হয়নি। ভাবতে ভাবতে প্রভাত তার চেনাজানা

ডাক্তারের কাছে গেলো। একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়ে চললো ভূমিত্রীর কাছে। তখন সন্ধে গড়িয়ে গেছে।

ভূমিত্রী বাড়িতেই ছিলো। ছোট ভাইবোনদের পড়াচ্ছিলো, তার নিজেরই ঘরে ব'সে।

দরজা খুলে দিয়েছেন ভূমিত্রীর মা মহামায়া।

'অনেক দিন পরে এলে। অসুখবিসুখ করেছিলো নাকি। শরীর তো ভালো দেখি না ?'—মহামায়া বললেন।

'হ্যাঁ শরীরটা ঠিক ভালো যাচ্ছে না'—প্রভাত হেসে বললো।

'যাও, ভূমি আছে। ওর ঘরেই আছে, যাও না।'

প্রভাত গিয়ে ভূমিত্রীর ঘরের পর্দা তুলে দোরগোড়ায় দাঁড়াতেই বাচ্চারা সব কলরব ক'রে উঠলো। আট বছরের বিধাত্রী তো ছুটে এসে প্রভাতকে জড়িয়ে ধরলো।

কিন্তু বাচ্চারা অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝে নিলো আজ জমবে না। প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের উৎসাহ আর দুরন্তপনা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

ভূমিত্রী সবাইকে বিদায় ক'রে দিলো ঘর থেকে। যে যার বইখাতা নিয়ে অন্য ঘরে চ'লে গেলো।

'বসুন একটু'—ব'লে ভূমিত্রীও বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। বাথরুমে গিয়ে চোখমুখ ভালো ক'রে ধুয়ে মুছে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলো। আয়নাটা বাথরুমে নেই দেখে তার রাগ হ'লো গায়ত্রীর ওপর। বৌদি সুপ্তিকে গিয়ে বললো, 'বৌদি ভাই, একটু চা বানিয়ে দেবে ?' 'একশোবার !'—ব'লে সুপ্তি মুখ টিপে হাসলো। ভূমিত্রী সুপ্তির নাকে একটা চিমটি কেটে ফিরে এলো ঘরে।

প্রভাত একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো। টেবিলের সামনে ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় সে বসেছে।

ভূমিত্রী খাটের ওপর বসলো।

ব্যবধান সামান্যই।

প্রভাত বললো, 'কাল জয়েন করছি না। একটা সিক-সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছি। এই যে নিন ধরুন। অফিসে দিয়ে দেবেন।'

'কী হয়েছে আপনার ?'

'অসুস্থ।'

'শারীরিক না মানসিক ?'

'তুইই।'

'হঠাৎ অসুস্থ হলেন কী ক'রে? সেদিনও তো এরকম চেহারা দেখিনি?'

'আজ বৃষ্টিতে খুব ভিজেছি।'

'কেন?'

'ভিজে গেলাম। বাধ্য হয়ে ভিজলাম। ঝেঁকে বৃষ্টি এলো, কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা পেলাম না।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু আপনার হয়েছে কী বলুন তো সত্যি ক'রে।'

'কী আবার হবে।'

ভূমিত্রী অপলকে তীক্ষ্ণ নজরে প্রভাতের মনের আদ্যোপান্ত দেখে নেবার চেষ্টা করছিলো। সন্দেহে, রাগে, করুণায়, মায়ায় ভূমিত্রীর মনে তখন তোলপাড় চলছে।

'কিছুই হয়নি?'—ভূমিত্রী ফের জিগ্যেস করলো।

নিরুত্তরে প্রভাত হাতের বইটার মধ্যে পড়বার মতো কিছু আছে কিনা দেখতেই ব্যস্ত হয়ে রইলো।

ভূমিত্রীও অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রে প্রভাতের ভাবসাব দেখলো। নিয়মিত দাড়ি কামানোর ব্যাপারে প্রভাতের যে শৈথিল্য আছে তা ভূমিত্রী দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু ওর চোয়ালভাঙা দাড়ি-না-কামানো রুক্ষ মুখখানায় আজ ওর স্বাভাবিক উজ্জ্বল প্রাণময়তার চিহ্নমাত্রও নেই, এইটে লক্ষ্য ক'রেই ভূমিত্রীর মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিলো।

'সার্টিফিকেট তো আপনি ডাকেই পাঠাতে পারতেন!'

'কী ক'রে? আজ সন্ধের সময় তো বুঝলাম। আপনার অসুবিধে হবে?'

'হ্যাঁ হবে!'

'ঠিক আছে। দিয়ে দিন।'

'কী ক'রে পাঠাবেন?'

'ডাকেই পাঠাব। দিন তাহ'লে। আর দেরী করব না। দিন।'

ভূমিত্রী আদৌ ব্যস্ত হ'লো না। শান্ত নির্বিকারভাবে বললো, 'কোথায় যাবেন এখন?'

'পোস্টাপিসে।'

'সে তো কখন বন্ধ হয়ে গেছে।'

প্রভাত একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনিই দিয়ে দেবেন তাহ'লে।'

'অবিশ্যি কোন কোন পোস্ট অফিস শুনেছি সারা রাত্র খোলা থাকে।'

প্রভাত এবার হাসলো।

কিন্তু সে-হাসি দেখে ভূমিত্রী আশ্বস্ত হতে পারলো না।

'কী হয়েছে বলবেন না?'—ভূমিত্রী খুব মিনতি ক'রে বললো।

'মানুষের শরীর খারাপ হতে নেই কখনো?'—প্রভাত হাসিটা মুখে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করছিলো।

ভূমিত্রীর হঠাৎ বুকের মধ্যে কেন যে মোচড় দিয়ে উঠলো। আশঙ্কা হ'লো লোকটার গায়ে জ্বর নেই তো? এ-কথা মনে হবার সঙ্গেসঙ্গে ভূমিত্রী ওর গায়ে হাত দিয়ে জ্বর হয়েছে কিনা পরীক্ষা না ক'রে পারলো না।

'গা তো গরমই। জ্বর তো হয়েছে। কীরকম মানুষ আপনি! জ্বর নিয়েই বেরিয়েছেন যে বড়ো?'

'বিনা কাজে আসিনি।'

ভূমিত্রী ভয়ানক রেগে গেলো। বললো কড়া মেজাজে, 'হ্যাঁ কাজ ছাড়া আপনি আসেন না তা আমার খেয়াল আছে, সে কথা না বললেও চলবে।'

'সে কী! কাজ ছাড়াও তো আসি আমি।'

'চুপ করুন। বৃষ্টিতে ভেজার দুর্বুদ্ধি কেন হয়েছিলো বলুন দেখি।'

'ঐ এক কথা আর কবার জিগ্যেস করবেন?'

চা আর পাঁপরভাজা নিয়ে গায়ত্রী ঢুকলো। ঘরের গাম্ভীর্য দেখে সে মুখ মচকে ওগুলো টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেলো। দরজার বাইরে এসে ফের মুখ বাড়িয়ে সে জিগ্যেস করলো, 'দিদি তুমি খাবা চা?'

'আছে?'

'হুঁ।'

'আন।'

গায়ত্রী আর এক কাপ চা আর পাঁপরভাজা দিয়ে চলে গেলো।

'খেয়ে নিন। জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে প্রভাত খাওয়া শুরু করলো।

'আমি আবার জিগ্যেস করছি, কী হয়েছে বলুন আমাকে।'

'কিচ্ছু হয়নি।'

'নভসির সঙ্গে দেখা করেছিলেন ছুটির মধ্যে?'

প্রভাত স্পষ্টতই কেঁপে উঠলো। বললো, 'না।'

'বলেছিলেন যে?'

'কী বলেছিলাম ?'

'ওকে নিয়ে একদিন আসবেন।'

'বলেছিলাম নাকি ?'

'নভসির সঙ্গে ঝগড়া করেছেন নাকি !'

'তা করেছি।'

'ও !'—ভূমিত্রী ঠোঁট কামড়ে বললো, 'কী নিয়ে হ'লো ঝগড়া ?'

'এ আলোচনা আজ থাক।'

'কেন ! সহ্য হচ্ছে না বুঝি !'

'আমি আজ চলি।'—ব'লেই প্রভাত উঠে পড়লো।

'একটু বসুন দয়া ক'রে। আমি আসছি।'—ব'লে ভূমিত্রী বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। অবিশ্যি বেরুলো রাগের মাথায়। কেন যে হঠাৎ বেরিয়ে এলো ঘর থেকে তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু তবুও, বেরিয়ে পড়েছে ব'লেই, সে ফের বাথরুমে গেলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বাথরুমের মধ্যে দরজা বন্ধ ক'রে। কেন দাঁড়িয়ে রইলো, দাঁড়িয়ে কী ভাবলো জিগ্যেস করলে সে কিছুই বলতে পারত না।

ফিরে এসে বললো, 'চলুন।'

রাস্তায় বেরিয়ে ভূমিত্রী জিগ্যেস করলো, 'এখন বাড়িতেই ফিরবেন তো ?'

'কেন বলুন তো।'

'কেন আবার কী। গায়ে জ্বর খেয়াল নেই !'

'ও হ্যাঁ, বাড়িতেই ফিরব।'

'ফুলকাকীমার কোন খবর পাওয়া যায়নি তো, না ?'

'না।'

'কিছু চেষ্টাও আর হচ্ছে না ?'

'তা একটু-আধটু না হচ্ছে এমন নয়।'

'আচ্ছা আনা দুই পয়সা দিন তো। আছে তো বাড়তি ? মানে যাবার বাসভাড়াও থাকবে তো ?'

প্রভাত অবাক মুখে একটা আধুলি ভূমিত্রীর হাতে দিলো।

'একটু দাঁড়ান।'—ব'লে ভূমিত্রী একটা ডিসপেনসারিতে ঢুকে পড়লো।

ফিরে এসে বললো, 'এই নিন। বাড়িতে গিয়ে একটা ট্যাবলেট খেয়ে নেবেন। বেশী বাড়াবাড়ি মনে হ'লে দুটোই খাবেন। নিন পয়সা রাখুন।'

'ও ভালোই করেছেন। আমিও ভাবছিলাম কিছু একটা খেলে হত।'

'জ্বর যদি না বাড়ে, আর কতদিন অফিস কামাইএর মতলব ?'

'একদিনও না।'

'তার মানে ? সাত দিনের আন্দাজ তো সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন।'

'হ্যাঁ। দিন সাতেক তো বটেই। মানে, গিয়ে তো দেখব, পাহাড়প্রমাণ এরিয়ার্স। অত পরিশ্রম পারব না এই শরীর নিয়ে।'

'কে আপনাকে পারতে বলছে। কিন্তু জ্বর না বাড়লে, বাড়ি থেকে তো বেরুবেন, না কী ?'

'হ্যাঁ তা তো বটেই।'

'কোথায় যাবেন ? দেশবন্ধু পার্কে !'

'ও-প্রসঙ্গ কেন বারে-বারে তুলছেন'—প্রভাত একটু যেন রেগে উঠলো।

'ও বাবা! এত! ও-প্রসঙ্গ তোলাই যাবে না! তা'লে কী প্রসঙ্গ তুলি বলুন। ফুলকাকীমার কথা জিগ্যেস করলেও তো চটে যাবেন।'

'না তা চটব কেন। ফুলকাকীমার কোন খোঁজ না থাকলেও, তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য সম্প্রতি পেয়েছি যা বললে হয়তো খুবই অবাক হবেন। অন্তত আমি তো হয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিলো ফুলকাকীমা সম্বন্ধে আমি সব কিছুই জানি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এমন অনেক কিছুই জানতাম না যা জানলে হয়তো তাঁর সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ অন্যভাবে চিন্তা করতে হ'ত। কোন কোন বিষয়ে ভুল ধারণাও ছিলো।'

'কী ব্যাপার ?'

'আমার ধারণা ছিলো ফুলকাকীমার সঙ্গে ফুলকাকুর বিয়ে প্রেমজ। কিন্তু এখন শুনছি আদৌ তা নয়। ফুলকাকীমার বরং আপত্তি ছিলো বিয়েতে।'

'তারপর ?'

'ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অবিশ্যি ছিলো। বহুকাল ধরেই ছিলো, বিয়ের আগেও। আসলে ফুলকাকুরও নাকি খুব একটা আগ্রহ ছিলো না এই বিয়েয়। অনেকটা দায়ে প'ড়েই রাজী হয়েছিলেন। ফুলকাকু ওঁকে গান শেখাতেন। মানে বিয়ের আগে আর কি। সেই ব্যাপারেই ঘনিষ্ঠতা। ফুলকাকীমারা খুব গরীব ছিলেন। ফুলকাকীমার মা'র চাপে প'ড়েই আসলে এই বিয়েটা হয়েছিলো।'

'তারপর ?'

'হ্যাঁ তারপর যেটা সবচেয়ে বড়ো খবর, মানে আমি যা শুনে সব চাইতে

আশ্চর্য হয়েছি সে হচ্ছে এই যে, ফুলকাকীমা একটি লোককে ভালোবাসতেন। বিয়ের আগে। এবং সেই লোককেই নাকি ফুলকাকীমা পাবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কী কারণে জানিনে সে-বিয়ে নাকি অসম্ভব ছিলো। বিয়ের পরেও ফুলকাকীমার এই ভালোবাসা ম'রে যায়নি। যা টের পাবার ফলে ফুলকাকু অত অত্যাচার করেছেন ওঁর ওপর। এবং এখন বুঝতে পারি, কেন আমার পরিবারস্থ কেউ কেউ কোনদিনই ফুলকাকীমাকে পাগল ব'লে স্বীকার করতেন না। তাঁরা আগাগোড়াই ফুলকাকীমার সমস্ত পাগলামিকেই ভান বা অভিনয় ব'লে মনে করতেন।'

'আরো কিছু আছে নাকি!'

'তা আছে। এবার পালানোর আগে ফুলকাকীমা কয়েক বছর আগে আরো একবার পালিয়েছিলেন। পালিয়ে নাকি সেই ভদ্রলোকের কাছেই গিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সে-ভদ্রলোক ইতিমধ্যে বিয়ে-টিয়ে ক'রে মস্ত সংসার বানিয়ে গুছিয়ে বসেছেন, তিনি ওঁকে জায়গা দেবেন কেন। বুঝিয়েসুজিয়ে বিদেয় ক'রে দিয়েছেন।'

'তারপরের খবর তো এই যে তাতেও ফুলকাকীমার সেই ভদ্রলোকের ওপর টান কমেনি এবং আপনারা সন্দেহ করছেন যে উনি হয়তো এবারও ওঁর ওখানে গিয়েই উঠেছেন?'

'তা অনেকটা তাই বটে। কিন্তু সে-খবরও হয়ে গেছে। সেই ভদ্রলোক হয়তো জানেন ফুলকাকীমা কোথায় আছেন, কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়িতেই ঠিক নেই।'

'আপনার শেষ হয়েছে?'

'বোধ হয় হয়েছে।'

'আমি কিন্তু আপনার এই খবরগুলিতে মোটেই অবাক হলাম না। বরং এখন সমস্ত বিষয়টা বেশ স্পষ্ট আর স্বাভাবিক হয়ে গেলো। আমি মনে মনে এমনি সন্দেহ আগেও করেছিলাম। আপনি যখন অন্যরকম গল্প বলতেন তা আমার খুব অস্বাভাবিক আর অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ত।'

'তাহ'লে আপনারও মত এই যে ফুলকাকীমার পাগলামিটা—অভিনয় মাত্র?'

'যাঁকে আমি চোখে পর্যন্ত দেখিনি তাঁর সম্পর্কে অত বড়ো মতামতটা না-ই বা দিলাম। তবে এইটে বলতে পারি যে, আপনার মুখে ফুলকাকীমার গল্প শুনে শুনে তাঁকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম, এখন এই নতুন খবর শুনে সেই ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধাও মেলাতে পারছি।'

প্রভাত চুপ ক'রে রইলো।

ভূমিত্রী একটু পরে ফের বললো, 'কাকে বলেন অভিনয়? সত্যকে গোপন ক'রে মিথ্যার মুখোশ এঁটে তোতাপাখীর মতো কতগুলো বানানো বুলি আউড়ে যাওয়া, তাকেই তো অভিনয় বলা উচিত। তা যদি মেনে নেন, তাহ'লে অভিনয় করেন আপনি, অভিনয় করি হয়তো-বা আমিও, অভিনয় করে সংসারের পনেরো আনা লোক। মিথ্যাচারটাকেই নিয়ম আর স্বাভাবিক বানিয়ে ফেলেছি আমরা। কিন্তু যে দু-চার জন লোক তা মেনে নেয় না, নিতে পারে না তাদের আমাদের সংসর্গ থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী গতি থাকতে পারে!'

ভূমিত্রী উত্তেজনাবশে কথাটা ব'লে ফেলেই তীক্ষ্ণ নজরে প্রভাতের প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করছিলো। ভূমিত্রী আশঙ্কা করছিলো প্রভাত এরকম নাটকীয় কথায় হেসে উঠবে, বাহবা দেবে। প্রভাতের চোখে বিদ্রূপের একটা প্রচ্ছন্ন আভাস যে সে না টের পেলো এমন নয়, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, বিনা প্রতিবাদে প্রভাত বিষণ্ন ভারাক্রান্তভাবে হাঁটতে লাগলো।

ফলে ভূমিত্রীর উত্তেজনা আরো চড়লো, 'আপনাদের যা নীতি, অনুশাসন, নিয়ম, তা পালন করতে হলে লোক হয় পাগল হবে নয় আত্মহত্যা করবে। তাছাড়া তাদের আর পথ নেই। লজ্জা করে না নীতি আর আদর্শ নিয়ে লম্বা গলা ক'রে বক্তৃতা দেন, এর-তার কাছে বাহাদুরী করেন, অথচ আপনারা নিজেরা কী! আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত!'

বলতে বলতে ভূমিত্রী স্পষ্টই লক্ষ্য করলো, আঘাতটা প্রভাতের পক্ষে মারাত্মক হয়েছে। মানুষকে চাবুক মারলে তার চোখমুখের যেমন অবস্থা হয় প্রভাতের চোখমুখও তেমনি অবসন্ন, কাতর, দুঃস্থ হয়ে পড়ছে ক্রমেই। দেখে ভূমিত্রীর বুকের মধ্যে কেঁদে উঠলো, কিন্তু তার মুখেচোখে ঘৃণার যে ঢল নেমেছিলো তা সে না সংবরণ করতে পারলো, না প্রভাত যখন এরপরেই বিদায়বাণী উচ্চারণ ক'রে সহসা বাসে উঠে পড়লো তখন সে বাধা দিতে পারলো।

১৫

এর দিন তিনেক পরে।

অফিস-ছুটির পরে ভূমিত্রী ট্রামের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলো, ডালহৌসি স্কোয়ারের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে।

অলকাতিলকা রায় সেই হুড়োহুড়ির মধ্যে ভূমিত্রীকে আবিষ্কার করলো।

'ভূমিত্রী'—অলকা চেঁচিয়ে ডাকলো।

ভূমিত্রী ভিড় থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

'ওঃ তোমাকে আমি মনে-মনে খুঁজছিলাম। ভগবান ঠিক মিলিয়ে দিয়েছেন'—অলকা বললো।

'ভগবানের সাহায্য ছাড়াও আপনি ইচ্ছে করলেই তো আমাকে খুঁজে পেতে পারতেন'—ভূমিত্রী হাসিমুখে বললো, 'ফোন করতে পারতেন। তাছাড়া আমার অফিসও আপনি চেনেন। তা হঠাৎ?'

অলকার মুখে হাসি ছিলো না। সে গম্ভীর মুখে বললো, 'খুব তাড়া আছে নাকি ফিরবার?'

'না, তাড়া কী। কী ব্যাপার বলুন তো।'

'তাহ'লে চলো হাঁটতে হাঁটতে যাই।'

দুজনে হাঁটা শুরু করলো চৌরঙ্গীর দিকে।

'খবর তো শুনেছো সব?'—অলকা ভারাক্রান্ত গলায় জিগ্যেস করলো।

ভূমিত্রী অবাক হয়ে বললো, 'কী খবর?'

অলকাও অবাক। জিগ্যেস করলো, 'কেন প্রভাতবাবু বলেননি?'

ভূমিত্রী চমকে উঠলো। বললো, 'কে?'

'প্রভাতবাবু। প্রভাত বোস গো।'

'তাকে আপনি চেনেন নাকি?'

'চিনি বৈকি। তিনিও চেনেন। তবে ভালো আলাপ নেই অবিশ্যি।'

'কী ক'রে চেনেন?'

'আমি নভসির প্রাইভেট টিউটর ছিলাম। প্রভাতবাবু তো ওদের বাড়ি যেতেন। তাইতে।'

'ও। প্রভাতবাবু তো বলেননি কখনো আপনার কথা। তা, কী খবরের কথা বলছিলেন?'

এরপর অলকা চুপ ক'রে রইলো। ভূমিত্রীর ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছিলো। বারকয়েক তাড়া দেবার পরে, অলকা ফের জিগ্যেস করলো, 'প্রভাতবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয় না?'

সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভূমিত্রী হঠাৎ অন্য প্রশ্ন করলো, 'আপনি কী ক'রে জানলেন প্রভাতবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে?'

'নভসির কাছে শুনেছিলাম। তা সে যাই হোক, প্রভাতের সঙ্গে দেখা হয় কিনা বললে না তো?'

'অনেক দিন যাবৎ সে ছুটিতে আছে। অবিশ্যি দিন তিনেক আগে আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন। দেখাও হয়েছে।'

'দিন তিনেক আগে? মানে? কী বার?'

ভূমিত্রী একটু মনে ক'রে বললো, 'মঙ্গলবার সন্ধের সময়।'

'মঙ্গলবার? সন্ধে? তা প্রভাতবাবু তো তখন জানতেন। অমর তাকে সকালেই খবর দিয়েছিলো, সেদিনই।'

'কী খবর বলুন না'—ভূমিত্রীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো।

'প্রভাতবাবু খবরটা বেমালুম চেপে গেলো! লোকটা তো ভীষণ!'

'অলকাদি, আপনার পায়ে পড়ি, কিসের খবর সেইটে আগে বলুন।'

'নভসি আত্মহত্যা করেছে।'

ভূমিত্রী ভয়ানকভাবে চমকে উঠলো।

'আত্মহত্যা করেছে গত রববার রাত্রে। বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে। বীভৎস সেই মৃত্যু। ওর মা-ও হয়তো বাঁচবেন না। বেচারী শোকে পাগলের মতো হয়ে গেছেন।'

ভূমিত্রী স্তব্ধ হয়েই রইলো।

'নভসি এত সাংঘাতিক কাণ্ড ক'রে বসবে আদৌ বুঝতে পারিনি। বুঝলে আগেই সাবধান হতে পারতাম। তোমার সঙ্গে দেখা করবার কথা আমি বেশ কিছুকাল ধ'রেই ভাবছিলাম। নানান ঝঞ্ঝাটে আর হয়ে উঠছিলো না। তখন তো আর বুঝিনি, এত শীগগীর এমন একটা কিছু ঘটে যাবে।'

'আমার সঙ্গে দেখা ক'রে কী করতেন?'

'তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারতাম। শুধু তোমাকেই না, প্রভাতবাবুর সঙ্গেও দেখা করব ভেবেছিলাম। তাকেও বোঝাতে পারতাম।'

'কী বোঝাতেন ?'

'নভসির মনের অবস্থা। ওর হিস্টিরিয়া হবার পরে খবর পেয়ে আমি যেদিন ওকে দেখতে গেলাম, সে হচ্ছে শনিবার। রববার রাত্রেই এই কাণ্ড।'

'আর আমাকে ? আমাকে কী বোঝাতে আসবেন ভেবেছিলেন ?'

'কী বোঝাতে মানে! বোঝোই তো।'

'কী বুঝব ? আমি আপনার কথাটা আদৌ কিছু বুঝতে পারছি না।'

'কেন, না বোঝার কী আছে!'

'বুঝিয়েই বলুন না'—ভূমিত্রী উত্যক্ত হয়ে বললো।

'এও কি বুঝিয়ে বলতে হবে যে নভসির মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী!'

ভূমিত্রী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো অলকার মুখের দিকে।

'এত অবাক হবার ভান করছো কেন ?'—অলকা আবার বিদ্রূপ করলো।

'আপনি অকারণে আমাকে যা-তা বলছেন!'—ভূমিত্রী সহসা ভয়ানক রাগ ক'রে উঠলো, 'আমি এ-সব গোলমেলে ব্যাপারের কিছুই জানি না।'

'না'—অলকাও রুখে উঠে বললো, 'সম্পূর্ণ দায়িত্ব এড়াতে তুমি কিছুতেই পারো না। অবিশ্যি দায়িত্ব সব চাইতে বেশি প্রভাতের। তার মোটেই উচিত হয়নি নভসির মতো একটা অনভিজ্ঞ ছেলেমানুষের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করা। কার সঙ্গে কার ভাব হবে সে-বিষয়ে অবিশ্যি কোন নিয়ম চলে না। আপত্তি চলে, বাঁধাবাঁধি চলে না। তা আমি জানি। তা আমি বলছিও না। একসঙ্গে সে তোমাদের দুজনের সঙ্গে শুধু কেন, পঞ্চাশটা মেয়ের সঙ্গে ভাব ক'রে বেড়ালেও বলবার কিছু নেই, সে অধিকার সকলের আছে। কি পুরুষ কি মেয়েদের। আমি সে-বিষয়ে আপত্তি তুলিনি। কিন্তু নভসি যে বড়ো ছেলেমানুষ ছিলো। সমাজ-সংসারের গলদ-গ্লানি ও বেচারী যে কিছুই বুঝত না। শিশুর মতো সরল—'

বলতে বলতে অলকার চোখ থেকে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগলো। গলা ভেঙে পড়লো, হাঁপাতে লাগলো।

ভূমিত্রী কিছুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে রাস্তা হাঁটলো। অলকাতিলকা রায়কে সামলে উঠতে অবকাশ দিলো।

'আপনার কথাবার্তা'—ভূমিত্রী না ব'লে পারলো না, 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। কেন এসব তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন, কী বা তার তাৎপর্য, সবই আমার কাছে প্রহেলিকা ঠেকছে। প্রভাতবাবুর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা আছে সে-কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনি যা বলতে চাইছেন, সেরকম কোন

সম্পর্ক ওর সঙ্গে আমার নেই তো। এবং আমি যতদূর জানি, প্রভাতবাবুর সঙ্গে সেরকম কিছু নভসির সঙ্গেও কখনোই ছিলো না। তার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তা তো এই যে, লোকটির আর কিছু না থাক, দায়িত্ববোধ আছে।'

'ভালোই!'

'আমার সম্বন্ধে নভসি আপনার কাছে কী বলেছিলো?'

'থাক বাছা। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

ভূমিত্রী চুপ ক'রে গেলো।

ট্রাম-স্টপেজে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিলো।

'আচ্ছা চলি তাহ'লে'—অলকা বললো, 'নৃপেনকে জানিয়ে দেব!'

ভূমিত্রী অবজ্ঞার ভঙ্গী করলো।

'তা বিয়ের খবরটা যেন পাই! বাদ পড়ি না যেন!'—অলকা কথাটা খুব শ্লেষ দিয়ে বলবার চেষ্টা করলো।

'খবর পেয়ে কী করবেন?'—ভূমিত্রীর চোখ জ্বলে উঠলো, 'খেতে আসবেন?'

'কী বললে?'—অলকা আগুন হয়ে বললো।

'যে ব্যাপারে আপনার এত আপত্তি সে ব্যাপার যদি ঘটেই কখনো তাহ'লে আপনি আনন্দ করতে আসবেন—এ তো আপনার কথাবার্তা শুনে আশা হয় না। সেইজন্যেই বললাম!'

'এতদূর তোমার সাহস!'—অলকার ঠোঁট কাঁপছিলো।

'সাহস নয়। আমি শুধু আপনার অভদ্রতার জবাব দিয়েছি। আপনাকে আমি শ্রদ্ধেয় ব'লেই জানতাম। আপনার মনের মধ্যে যে এত গলদ তা তো কোনদিন টের পাইনি। শুধু নৃপেন কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে ডেকে ডেকে আপনি জানাতে পারেন প্রভাতকে আমি পছন্দ করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সে কোনদিন আমাকে বিয়ের কথা তো বলেনি।'

উত্তেজনার মাথায় কথাগুলো ব'লে ফেলেই ভূমিত্রী ঠোঁট কামড়ালো। একথা তো সে বলতে চায়নি। লজ্জায় ধিক্কারে সে মরমে ম'রে গেলো। গ্লানির ভারে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো, কিন্তু এ যে প্রকাশ্য রাস্তা। অলকার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সে ট্রামে উঠে পড়লো।

১৬

সমস্ত রাত ভূমিত্রী ছটফট করলো। প্রথম দিকে সে ঘুমনোর চেষ্টাই করেনি। বরং মনের মধ্যে যে সব-কিছু জট পাকিয়ে গেছে, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা-স্মৃতি যে এলোমেলো বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচার-বিবেচনা সব কিছুই যে মনে হচ্ছে রসাতলে গেছে—তারই পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়, মনটাকে শান্ত সংযত আত্মস্থ করবার চেষ্টায় রাতের প্রথম দিকে সে বালিশে মুখ গুঁজে কাঠ হয়ে প'ড়ে ছিলো। পাশে ঘুমোচ্ছে গায়ত্রী। কিছুতেই যখন ভূমিত্রী মনের মধ্যকার ঝড় শান্ত করতে পারলো না, ক্লান্ত শ্রান্ত চেতনায় সে উঠে ব'সে রইলো, অন্ধকারের মধ্যে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে। একসময় গায়ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে দেখলো ঘামে ভিজে গেছে ও একেবারে। পাখাটা হাতড়ে নিয়ে সে গায়ত্রীকে হাওয়া করলো, নিজেও হাওয়া খেলো। গায়ত্রীর ঘাম শুকলো ক্রমে। কিন্তু তার নিজের যন্ত্রণার কিছুই যে লাঘব হ'লো না। বাথরুমে গিয়ে গায়ে-মুখে জল দিয়ে আসতে পারলে হ'ত। কিন্তু যা কোনদিন হয় না তার, সে নিজেই অবাক হয়ে গেলো ভেবে যে, বাথরুমে যাবার কথা চিন্তা করতেই দারুণ এক বিভীষিকায় সে আক্রান্ত হ'লো। সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এমনকি মশারির বাইরে গিয়ে আলোটা যে জ্বালবে সে-সাহসও সে হারিয়ে ফেললো। গরমে, তৃষ্ণায়, আতঙ্কে যেন তার দম বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো, জিভ শুকিয়ে গেলো, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগলো। অসহ্য রাত তাকে প্রায়ই কাটাতে হয়, কিন্তু সে-সবের যেন সীমা ছিলো আজকের তুলনায়, তার নিজেরই একথা মনে হ'লো।

আবার সে বালিশে মুখ থুবড়ে পড়লো অসহায়ের মতো। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কান্নার বন্যা এলো এবার দু-চোখ বেয়ে। চোখের জলে ভিজে গেলো বালিশ। তার ভয় হচ্ছিলো গায়ত্রী পাছে জেগে যায়। রাত এখন কত তা সে কিছুই বুঝতে পারছিলো না। বিছানাময় পিঁপড়ে আর ছারপোকা ছেয়ে গেছে ব'লে তার মনে হচ্ছিলো। দেখতে পারলে হ'ত। কিন্তু আলো জ্বালবে কে। ক্লেদাক্ত বীভৎস প্রেতায়িত অন্ধকার তার মনে হচ্ছিলো ওৎ পেতে ব'সে আছে মশারির বাইরে; তাকে গিলে খাবার

জন্য, অশুচি করবার জন্য, তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্য। কান্নায় বুক খালি হয়ে গেছে। এখন সমস্ত শরীর অবশ, বিষদগ্ধ। ঘুমনোর চেষ্টায়, তার যতরকম প্রক্রিয়া জানা ছিলো তার সব কিছুই একটার পর একটা প্রয়োগ ক'রে দেখতে লাগলো। কিন্তু সে-সব তার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিলো মাত্র।

রাতের একেবারে শেষ প্রহরে সে তন্দ্রার ঘোরে হারিয়ে গেলো। নানান উদ্ভট দুঃস্বপ্ন এবার পঙ্গপালের মতো তার অর্ধচেতন সত্তাকে আক্রমণ করলো, ভূতের দৌরাত্ম্য শুরু ক'রে দিলো। ঐ অবস্থায় সে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগলো মহাশূন্যে, মুখ থুবড়ে পড়তে লাগলো শূন্য নির্জন প্রান্তরে, শ্মশানচারী শকুনির দল তাদের কুৎসিত পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে বেড়াতে লাগলো তার মনের আকাশে, তার মাংস তার চৈতন্যকে ছিঁড়ে খেতে লাগলো।

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা ভূমিত্রীর বহুকালের অভ্যাস। কিন্তু সেদিন সে ভোরের দিকেই ঘুমিয়ে পড়লো।

মহামায়া বারকয়েক এসে দেখে গেছেন মেয়ে এখনো আজ বিছানা ছেড়ে উঠছে না কেন। গায়ে হাত দিয়ে দেখে গেছেন অসুখবিসুখ হ'লো কিনা। ঘুমন্ত মেয়ের মুখে ক্লান্তি আর রিক্ততার সর্বনাশা চিহ্ন প্রত্যক্ষ ক'রে মহামায়ার বুকের মধ্যে হাহাকার উঠেছে, নিঃশব্দে স'রে গেছেন ঘর থেকে। ছেলেমেয়েদের ব'লে দিয়েছেন গোলমাল না করতে, এ-ঘরে আজ পড়তে না দিয়ে বড়োছেলের ঘরে সবাইকে পাঠিয়েছেন।

ঘুম থেকে ওঠার পরও ভূমিত্রী সারা সকালটা ভূতগ্রস্তের মতোই কাটিয়ে দিলো। আচ্ছন্ন চেতনায় জবুথবু হয়ে রইলো। বাথরুমে গিয়ে কলের তলায় ব'সে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলো, সকালবেলা বাথরুম বেশীক্ষণ আটকে রাখা চলবে না। মহামায়ার ডাকাডাকিতেই ভূমিত্রীর হুঁশ ফিরেছে শেষে, পরমেশ তেল মেখে দাঁড়িয়ে ছিলো অপেক্ষায়, তারও অফিসের সময়।

কিন্তু ভূমিত্রী অফিসে গেলো না। সে-কথা অবিশ্যি সে কাউকেই জানালো না। অন্যান্য দিনের মতোই স্নান ক'রে খেয়েদেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। যাবার সময়ে যথারীতি সদর দরজার মাথায় দেয়ালে-টাঙানো ফ্রেমে-বাঁধানো বাবার রক্তচন্দনের পদছাপের নিচে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে বাবার উদ্দেশে প্রণাম করলো।

তারপর হেঁটেই চললো সে।

প্রভাতের বাড়িতে সে আগে কখনো না গেলেও, প্রভাতের বাড়ির ঠিকানা তার জানা ছিলো এবং বাড়িটা কোথায় সে-সম্পর্কে মোটামুটি একটা আন্দাজ করা ছিলো।

বাড়িটা খুঁজে বের করার পর ভূমিত্রীর মাথায় লজ্জার পাহাড় ভেঙে পড়েছিলো। ওঁর বাড়ির সবাই কী মনে করবে, ছি ছি। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত এসে ফেরাও অসম্ভব। প্রভাতের আস্তানা তিন তলায় তাও তার জানা ছিলো। ওপরে উঠে যাবার চাইতে এখান থেকেই কাউকে খবর পাঠানো যায় কিনা, আচ্ছন্নভাবে সে সেই কথাই ভাবছিলো। কিন্তু ওর যদি জ্বর বেড়ে থাকে ?

অফিসের সময়। শুধু পুরুষের দলই নয়, বেশ কিছু মেয়েও ত্রস্তে ব্যস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়িটার ফটক দিয়ে। মস্ত পাঁচতলা বাড়ি, কুড়ি-পঁচিশ ঘর ভাড়াটের বাস, এখানে কে কার ধার ধারে।

কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ ফটকের মুখেও দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। রাস্তার লোকেরা ইতিমধ্যেই নজর দিয়েছে। কৌতূহল ফুটেছে সামনের দোকানগুলোর লোকগুলোর চোখেমুখে।

শেষ পর্যন্ত ভূমিত্রী ওপরেই উঠে গেলো।

তার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে সে যা চাচ্ছিলো, তা-ই হ'লো। বাইরে বেরুনোর জন্যে প্রভাতও বেরুচ্ছিলো তখন, একেবারে সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেলো দুজনের।

'আপনি ?'—প্রভাত অবাক।

লজ্জায় আরক্ত হ'লো ভূমিত্রীর মুখ। কিছু একটা বলতে গেলো, কিন্তু একটি কথাও না ব'লে সে মুখ ঘুরিয়ে নিচে নামতে লাগলো।

আশ্চর্য হয়ে প্রভাত পিছু-পিছু নেমে এলো।

রাস্তায় প'ড়েও ভূমিত্রী সহসা মুখ খুললো না।

প্রভাত পাশে-পাশে হাঁটতে লাগলো নীরবে।

বড়ো রাস্তায় পড়বার পর প্রভাত ধৈর্য হারালো। বললো, 'কী ব্যাপার বলুন তো ? কোথায় চলেছেন ? অফিসে যাবেন না আজ ?'

ভূমিত্রী খুব জোরে ঘাড় নাড়লো।

'কেন ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করব ব'লে।'

'ও। শুধু দেখা করবেন ? না কথাও বলবেন ?'

ভূমিত্রী হেসে ফেললো।

'আপনার শরীরও তো বিশেষ ভালো দেখছি না ?'—প্রভাত বললো।

'কী ক'রে ভালো দেখবেন !'

'কেন ?'

'কীরকম ব্যবহার করছেন !'

প্রভাত থমকে গেলো মনে-মনে। কী বলতে চায় ভূমিত্রী ?

'তা এখন আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি ?'—প্রভাত জানতে চাইলো।

'যেদিকে নিয়ে যাবেন।'

'যেদিকে নিয়ে যাব ? এত আস্থা কি ভালো ?'

ভূমিত্রী তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো প্রভাতের দিকে।

প্রভাত গম্ভীর হয়ে গেলো। মুখের হালকা পরিহাসের ভঙ্গীটা তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো।

'বাড়িতে এলেন কষ্ট ক'রে। একটু তো বসতে পারতেন।'

ভূমিত্রী জবাব দিলো না।

'কী ক'রে চিনলেন বাড়ি ? ঠিকানা পেলেন কোথায় ?'

ভূমিত্রী নীরব।

'চলুন তাহ'লে কলেজ স্কোয়ারে গিয়েই বসি। এদিকে আর বসবার জায়গা কোথায়।'—প্রভাত বললো।

ভূমিত্রী ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

'কিন্তু বেলা এগারোটার সময় এই রোদ্দুরের মধ্যে'—প্রভাতই ফের বললো, 'কলেজ স্কোয়ারে ! সবাই ভাববে কী !'

ভূমিত্রী সহসা অন্য প্রশ্ন করলো, 'আপনার তাহ'লে জ্বর আর বাড়েনি ?'

'না। আমার সার্টিফিকেটটা দিয়ে দিয়েছিলেন তো ?'

ভূমিত্রী জবাব দিলো না।

'আচ্ছা তাহ'লে রেস্টুরেণ্টই সই। তাই চলুন।'—প্রভাত নতুন প্রস্তাব আনলো।

কিন্তু ভূমিত্রী সমর্থন করে না।

'তাহ'লে আপনিই বলুন'—প্রভাত হাল ছেড়ে দিয়ে বললো।

'বা-বা আমি বলব কেন। পুরুষমানুষ হয়েছেন কীজন্যে !'

ভূমিত্রীর আজকের কথাবার্তায় একটু অন্যরকম স্বর প্রভাত গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিলো। কীরকম একটা উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির, চঞ্চল ভাব ওর চোখে, মুখে, আচরণে, কথাবার্তায়। হাঁটছেও কেমন যেন একটা উত্তেজনা চাপবার প্রাণপণ প্রয়াসে। প্রভাতের মনের মধ্যে ঝড় উঠলো।

'আপনি কোথায় বেরোচ্ছিলেন?'—প্রভাতকে চুপচাপ দেখে ভূমিত্রী জিগ্যেস করলো।

'বিশেষ কোথাও না।'

'তার মানে?'

'তার মানে—এই এখানে-সেখানে যেতাম আর কি। এই ধরুন হয়তো একটা মাসিকপত্রের অফিসে। অথবা গঙ্গার পাড়ে। অথবা চিড়িয়াখানায়।'

ভূমিত্রী হেসে উঠলো, 'চিড়িয়াখানায়?'

'হ্যাঁ হাসবার কী আছে। আমি তো প্রায়ই যাই সেখানে। চমৎকার কেটে যায় সময়টা।'

'তাহ'লে তাই চলুন।'

'সত্যি যাবেন?'

'আপনার খাওয়াদাওয়া হয়েছে তো?'

'তা হয়েছে। আপনার?'

'ধন্যবাদ।'

'তাহ'লে আসুন ট্রামে উঠি।'

ট্রামবাস এখন ফাঁকা। একটা ট্রাম তবুও ছেড়ে দেওয়া হ'লো। কেন? না, ভূমিত্রী বললো, 'সামনের সিটটা খালি নেই। যেটার ঐ সিট খালি থাকবে সেটাতে উঠব।'

'আচ্ছা আমি বুঝি না'—হঠাৎ প্রভাত খুব দ্রুত, খুব আবেগের সঙ্গে, ছেলেমানুষী ভাবপ্রবণতায় ব'লে ফেললো, 'আমরা পরস্পর আপনি কেন বলি।'—ব'লেই প্রভাত লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

'তার জন্যে আপনিই দায়ী'—ভূমিত্রী মৃদু গলায় বললো।

'মেয়েদের এই দোষ। পুরুষ জাতটাকে ভালোমানুষ পেয়ে কঠিন কাজগুলো সব তাদের দিয়ে করিয়ে নেবে।'

'আহা! কী আমার ভালোমানুষ রে! কঠিন কাজ করতে পারেন না, পুরুষ হতে গিয়েছিলেন কেন।'

আর একটা ট্রাম চ'লে গেলো। এটারও সুমুখের আসন ভর্তি।

'উঃ পারছি না তো?'

'কী পারছেন না'—জোড়া ভুরু ধনুকের মতো বাঁকিয়ে ভূমিত্রী বললো।

'তুমি বেরোচ্ছে না!'

চাপা হাসিতে ভূমিত্রীর সমস্ত মুখখানা লাল টসটসে হয়ে উঠলো।

শেষে ভূমিত্রী বললো, 'পারিব না এ-কথাটি— ?'

'বলিও না আর। একবারে না পারিলে— ?'

'ছাখো শতবার।'

'এই তো ছুজনেরই হয়ে গেলো!'—প্রভাত বললো।

এবং সমস্বরে ছুজনেই হেসে উঠলো।

প্রত্যাশিত ট্রাম এলো। পাশাপাশি ছুজনে বসলো গিয়ে একেবারে সামনের আসনে।

কিন্তু আর একটি কথাও না। ছুজনেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে রইলো। ছুজনেরই মনের মধ্যে উত্তাল উদ্বেল হয়ে উঠলো মহাসমুদ্র তার বিপুল জলরাশি নিয়ে, একের মনের তরঙ্গভঙ্গ অন্যজন আজ সম্ভবত শুনতে পেলো। কিন্তু মধ্য-সমুদ্রের স্তব্ধতা ফুটে উঠলো উভয়েরই বাহ্যিক অস্তিত্বে।

চৌরঙ্গীতে নামবার পরে কিন্তু ভূমিত্রী রাজী হলো না চিড়িয়াখানায় যেতে। সে প্রস্তাব করলো গঙ্গার পাড়। আউটরাম ঘাট।

কিন্তু প্রভাত রাজী না।

'কেন ?'—ভূমিত্রী।

প্রভাত কিছুতেই কারণ বলবে না।

সুতরাং ভূমিত্রীর জেদ চেপে গেলো।

'শুনলে তুমি খুশী হবে না'—শেষ পর্যন্ত প্রভাত এই মন্তব্য করলো।

'তবুও শুনতে চাই।'

'তোমাকে আমি একটা খবর দিইনি। দিইনি কেন তা আমি নিজেই জানি না। হয়তো খবরটা অত্যন্ত অশুভ ব'লেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে-খবর তোমাকে আমার জানানো উচিত।'—প্রভাতের গলা কেঁপে উঠলো।

'জানি আমি। অলকাদি আমাকে বলেছে। নভসির কথা তো ?'

'হ্যাঁ। অলকাদি কে ?'

'অলকাতিলকা রায় তার পুরো নাম। সে তো বললো তুমিও তাকে চেনো।'

'হ্যাঁ চিনি। তোমার সঙ্গে কী ক'রে আলাপ ?'

'যে-ক'রেই হোক সেটা ছেড়ে দাও। নভসির আত্মহত্যার খবর আমি তার কাছে কাল সন্ধের সময় শুনেছি।'

'তাইতেই কি আজ খবর নিতে এসেছিলে ?'

'অনেকটা তা-ই বটে। কিন্তু কথাটা তুলে ভালোই হ'লো। ও আত্মহত্যা করলো কেন ?'

'কী জানি। এ আমার কল্পনার বাইরে ছিলো।'

'তুমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে সেদিন বলছিলে। সেই ঝগড়ার জন্যেই হয়তো?'

'ওর ভাই অমরও এমনি একটা কথাই ব'লে গেলো বটে। আমিই নাকি এর জন্যে দায়ী। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি আদৌ ভাবতে পারছি না তা সম্ভব।'

'কেন?'

'কোথাও বসতে পারলে হ'ত। এর'ম দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।'

'গঙ্গার দিকে তো যাবে না। চলো হাঁটি ঐ দিকে।'

কার্জন পার্কের দিকে এগুতে লাগলো দুজনে। চড়া রোদ, কিন্তু সে-বিষয়ে যেন দুজনের কারুরই বিশেষ হুঁশ ছিলো না।

'গঙ্গার পাড়ে তোমাদের কী হয়েছিলো?'—ভূমিত্রী জিগ্যেস করলো।

প্রভাত উত্তর দিলো না।

'বলতে আপত্তি আছে?'

'আপত্তি নেই। কিন্তু আজ থাক না। আর একদিন বলব 'খন। দিন কয়েক আগে ওকে নিয়ে ওদিকে গিয়েছিলাম তা ঠিকই। এবং ওর সঙ্গে সে-ই আমার শেষ সাক্ষাৎ! ও আমার কাছ থেকে হয়তো কিছু আশা করেছিলো, কিন্তু আমার পক্ষে যে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু তখনো বুঝিনি ও এত বড়ো কাণ্ড ক'রে বসবে। অবিশ্যি এ-কথা মেনে নিতে আমার মন সায় দেয় না যে, শুদ্ধমাত্র এই কারণেই ও আত্মহত্যা করেছে।'

'থাক'—ভূমিত্রী অত্যন্ত কোমল অত্যন্ত গাঢ় গলায় বললো, 'আর একদিন বলবে বললে যখন, পরেই শুনব। এখন এ-কথা ছেড়ে দাও।'

প্রভাত কথাগুলো বলতে বলতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ছিলো। তাই দেখেই ভূমিত্রী প্রত্যাহার করলো এই প্রসঙ্গ, উদার নীল আকাশের মতো সংবেদ্য হয়ে উঠলো তার দুই চোখ, প্রভাতের হাত সে আলতোভাবে একবার স্পর্শ করলো।

বসবার মতো একটা ছায়া খুঁজছিলো ওরা।

প্রভাত বললো অবশেষে, 'এক কাজ করি এসো। চলো বাড়িতেই যাই। রাস্তাঘাটে বসতে এখন ইচ্ছে করছে না।'

'কাদের বাড়ি?'—ভূমিত্রী।

'যে-বাড়িতে দুদিন বাদে তোমাকে যেতে বাধ্য করা হবে, সেই বাড়ি।'